বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

# বাংলাদেশে খনিজসম্পদ উন্নয়নঃ ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে বিরোধের একটি বিশ্লেষণ

ওমর ফারুক*

## ১। ভূমিকা

ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে ১৯৯৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মপ্রক্রিয়া শুরু হলেও বাংলাদেশে জনপরিসরে এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় ২০০৫ সালের মধ্যভাগে যখন ফুলবাড়ীর স্থানীয় জনগণ এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবিত উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করে। স্থানীয় মানুষ খনি উন্নয়নকে সরকার ও খনি কোম্পানির মতো করে ইতিবাচক অর্থে দেখেনি (বাবলু ২০০৫, দাস ২০০৯)। শুরুতে স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী এশিয়া এনার্জির কয়েকটি প্রচারপত্রকে পুঁজি করে বিশদভাবে এ প্রকল্প সম্পর্কে জেনে এর লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ তৈরির মাধ্যমে খনি কোম্পানি কর্তৃক তুলে ধরা উন্নয়নের বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং খনি প্রকল্পকে 'স্থানীয় ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী' প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধের ডাক দেন (দেখুন জাতীয় গণফ্রন্ট ২০০৫)।[১] এ প্রতিরোধের ভাষা ও আন্দোলনের স্লোগান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে স্থানীয় মানুষ তার স্বার্থহানি (জমি ও ভিটেমাটি হারানো) কীভাবে হবে তা সহজেই বুঝতে পারে। একই সঙ্গে দেশের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবার প্রক্রিয়াও (দুর্নীতিগ্রস্থ অসম চুক্তি) যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (মুহাম্মদ ২০০৭)। শুরু থেকেই তিনটি দাবীকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে যাতে এসব স্থানীয় ও জাতীয় দিক একীভূত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: 'উন্মুক্ত খনি চাই না'; 'বিদেশী কোম্পানির দ্বারা খনি উন্নয়ন করা যাবে না'; এবং 'খনিজ সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করা যাবে না' (জাতীয় কমিটি ২০০৫)। স্থানীয় সংগঠকদের ডাকে সাড়া দিয়ে তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ২০০৫ সালের আগস্টে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি[২] ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে তৈরি হবার পর থেকেই জ্বালানি খাতে 'সর্বজনের স্বার্থ' নিশ্চিতের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে (Faruque 2017)। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে ২০০২-২০০৩ সালে আন্দোলন করে এ সংগঠন বেশ আলোচিত হয় (মুহাম্মদ ২০০৬)। সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলন এর চলমান কর্মসূচি (জাতীয় কমিটি ২০১৩)।

---

* পিএইচডি গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা। প্রবন্ধটি রিভিউ করে মন্তব্য প্রদানের জন্য লেখক জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

[১] ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ফুলবাড়ী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ক কর্মতৎপরতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য; তাঁদের সংগঠনের নামের মধ্যেই ফুলবাড়ী খনিকে 'জাতীয় স্বার্থবিরোধী' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (দেখুন 'জাতীয় স্বার্থবিরোধী ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলন'র লিফলেটঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৭ নভেম্বর ২০০৫, ৮ ডিসেম্বর ২০০৫)।

[২] এ সম্পর্কে জানতে দেখুন,তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মেনিফেস্টো: *ঘোষণা* ও *পরিচালনা নীতিমালা*, (মার্চ ২০০৯)।

২০০৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৬ সালের জুলাই পর্যন্ত স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠকদের ফুলবাড়ী ও ঢাকায় আয়োজিত নানা কর্মসূচির জবাবে সরকার ও এশিয়া এনার্জি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।[৩] উল্লেখ্য, শুরু থেকেই খনি প্রকল্পের সব কর্মকাণ্ড এশিয়া এনার্জি এককভাবেই চালিয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ কিংবা আন্দোলনের সংগঠকরা সরকারি কোনো তৎপরতা দেখতে পাননি। আন্দোলনের তীব্রতা সত্ত্বেও কোম্পানির কর্মকাণ্ড এগিয়ে যাওয়ার কারণে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠকদের মিলিত উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ীতে খনি কোম্পানির অফিস ঘেরাও কর্মসূচির উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক (৬০-৭০ হাজার) মানুষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে সহিংস ঘটনা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে খনিজসম্পদ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় ফুলবাড়ী কয়লাখনি একটা প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। মাঠ গবেষণায় দেখা যায়, সরকার ও এশিয়া এনার্জি এ প্রকল্পকে দেশের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচকভাবে হিসেবে দেখলেও স্থানীয় জনগণের বেশিরভাগ এবং তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সংগঠক ও কর্মীরা একে অত্যন্ত নেতিবাচক হিসেবে দেখছেন। ফলে এ খনি সম্পর্কিত নানা বিষয়াবলী গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একটা প্রশ্নবিদ্ধ প্রকল্পের স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এ রকম প্রেক্ষাপটে এ প্রবন্ধে ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে বিরোধের একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশের জ্বালানি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নানা প্রতিবেদন ও এশিয়া এনার্জির নানা দলিলপত্র সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। যারা এ খনির বিরুদ্ধে ২০০৫ সাল থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাচ্ছেন তাদের আন্দোলন সম্পর্কিত নানা দলিল দস্তাবেজও সংযোগ দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১২ সালে দুই পর্বে লেখা ফুলবাড়ী অঞ্চলে আন্দোলনকারী ও স্থানীয় নানা পেশার শহর ও গ্রামের মানুষদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ২০১৩ সালে ঢাকায় আন্দোলনকারী সংগঠনের কর্মী ও সংগঠকদের, কয়েকজন আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক কর্মী ও খ্যাতনামা কয়েকজন জ্বালানি বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী হালনাগাদ করার জন্য ২০১৫ সালে পুনরায় কিছু সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। পাশাপাশি এ বিষয়ে ২০০৪-২০১৭ সময়কালে ফুলবাড়ী ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের নানা প্রতিবেদনও ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে সাজানো হয়েছে। ভূমিকার পর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে এর যাত্রা শুরু হয়ে আজকের বিরোধপূর্ণ অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে কয়লার মজুদ বিষয়ে জনপরিসরের আলোচনায় যে বিভ্রান্তি আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। ফুলবাড়ী কয়লাখনির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অনুচ্ছেদে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে জ্বালানি নিরাপত্তায় স্থানীয় কয়লার ব্যবহার বিষয়ক দাপুটে বয়ানে কৃষি ও দারিদ্র্য বিষয়কে অবহেলা করার প্রবণতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষ অনুচ্ছেদে এ খনি প্রকল্পের নানা বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ যুক্ত করা হয়েছে; এখানে খনিজসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও দুর্নীতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

[৩] উপরন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুরে এক সমাবেশে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঘোষণা দেন যে সরকার ফুলবাড়ী খনি তৈরিতে বদ্ধপরিকর (দেখুন ডেইলি স্টার, ১৩ মার্চ ২০০৬, প্রথম পাতা)।

## ২। ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প

১৯৯০ পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঊষালগ্নে আশির দশকে সামরিক আমলে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক উদারীকরণও দ্রুত গতিতে যাত্রা শুরু করে। এর একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবস্থাপনায় বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পথ সুগম করা (World Bank 1992)। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বেশ উদার নীতি গ্রহণ করে আইন পাস করে (MLJPA 1980)। এ আইনকে কেন্দ্র করে জ্বালানি খাতে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যে ও কারিগরি সহযোগিতায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের নানা চেষ্টা চালানো হয় (World Bank 1991)। ১৯৮২ সালেই বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপি যুক্তভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত নিয়ে বিশদ গবেষণা করে এখাতে রপ্তানিমুখী বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নির্ভর একটা কাঠামো দাঁড় করানোর পরামর্শ দেয় (World Bank 1982)। কয়েক বছরের মধ্যে বিদেশী তেল/গ্যাস কোম্পানিকে আকৃষ্ট করার জন্য একটা উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির মডেলও দাঁড় করানো হয় এবং ঢাকা, লন্ডন ও হিউস্টনে প্রমোশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয় (World Bank 1991)। এতদসত্ত্বেও বিদেশী পুঁজির তেমন সাড়া মেলেনি সম্ভবত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নানা তৎপরতার কারণে। ১৯৯০ এর পরে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐসব কোম্পানি বাংলাদেশে আসতে শুরু করে । তাদের কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি মন্ত্রণালয় জাতীয় পেট্রোলিয়াম নীতি ১৯৯৩ এবং জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৬ তৈরি করে (ইসলাম ২০০১)। এর মাধ্যমে সরকার এখাতে নব্য উদারীকরণ ধারার নীতি কাঠামো জোরদার করতে থাকে। এই নীতি কাঠামোর আলোকে খনিজ সম্পদ উন্নয়নেও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল। ১৯৯৪ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় অস্ট্রেলীয় কোম্পানি বিএইচপির সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি করে। বিএইচপি ১৯৯৭ সালে ফুলবাড়ী কয়লা খনি আবিষ্কার করে। শুরু থেকেই বিএইচপির পরিকল্পনা ছিল কয়লার সন্ধান পেলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মাটি খনন করে কয়লা উত্তোলন করা হবে। সাধারণত কয়লার গভীরতা কম হলেই উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি করা যায়। কিন্তু ফুলবাড়ীতে বিএইচপির আশা অনুযায়ী ১৩০ মিটার গভীরতার মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়নি । কয়লার গভীরতা ১৫০ মিটারের অধিক হওয়ায় বিএইচপি খনি উন্নয়নের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তার ব্যবসা গুটিয়ে নেয় (ডেইলি স্টার, ২৮ অগাস্ট ২০০৬, প্রথম পাতা)।[৪]

বাংলাদেশ থেকে সব কিছু গুটিয়ে নেবার আগে বিএইচপি ফুলবাড়ী প্রকল্প সংক্রান্ত সব গবেষণা, সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও এর অধীনে পাওয়া অনুসন্ধান লাইসেন্সসমূহ অস্ট্রেলীয় কোম্পানি এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) প্রোপ্রাইটরী লিমিটেডের কাছে বিক্রি করে দেয়। বাংলাদেশ সরকার বিএইচপির সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনুমোদন করে এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের বিদ্যমান খনি বিধিমালা অনুযায়ী খনি উন্নয়নে কোনো চুক্তি হলে তা যত শীঘ্র সম্ভব গেজেট আকারে প্রকাশের বিধান আছে। ফুলবাড়ী খনি নিয়ে এশিয়া এনার্জির সাথে বিএইচপির চুক্তি ও লাইসেন্স হস্তান্তর বিষয়ে

[৪] বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিলেও বিএইচপি তার আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে রেখেছে এ প্রকল্পের সাথে; ভবিষ্যতে ফুলবাড়ী খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করলে প্রথম আট মিলিয়ন টন কয়লার জন্য শতকরা ১ ভাগ হারে রয়্যালটি বিএইচপি পাবে বলে এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তি রয়েছে (AEC 2004a)।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের চুক্তিবদ্ধ হবার বিষয়ে কোনো গেজেট প্রকাশিত হয়নি। ২০০৬ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গেজেট নিয়ে তল্লাসি শুরু করলে ঐ সালের জুন মাসে চুক্তি স্বাক্ষরের ৮ বছরেরও বেশি সময় পরে সংক্ষিপ্ত একটি গেজেট প্রকাশ করা হয়।[৫]

বিএইচপির কাছ থেকে ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট পদ্ধতিতে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের চুক্তি, গবেষণা ও অনুসন্ধান লাইসেন্স কিনে নেবার সময় এশিয়া এনার্জির মূল পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় বাজারে কয়লার চাহিদা পূরণের নিমিত্তে একটা ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির (বড় পুকুরিয়া খনির মতো) খনি তৈরি করার (Islam 2008)। সেজন্য ২০০০ সালের দিকে এশিয়া এনার্জি কিছু ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করে খনি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে। ২০০১ সালের পর নতুন সরকারের কাছ থেকে এশিয়া এনার্জি উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি তৈরি করার আশ্বাস পেয়ে আরও কিছু কারিগরি সমীক্ষা করে। এর আলোকে ২০০৩ সালের দিকে বার্ষিক ৯ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের টার্গেট করে; যার ৬ মিলিয়ন টন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হবে বাকি ৩ মিলিয়ন টন স্থানীয় অন্যান্য চাহিদা (ইটের ভাটা) পূরণের জন্য সরবরাহ করা হবে (AEC 2004b)। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নানা খনিজ পদার্থের দাম ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। কয়লার বাজার উচ্চমুখী হওয়ায় ও এশিয়ার বাজারে বিশেষ করে চীন ও ভারতে কয়লার চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ায় এশিয়া এনার্জি তার বিনিয়োগ পরিকল্পনা পরিবর্তন করল । এ নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা হবে, যার ১২ মিলিয়ন টন ভারতসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হবে; ৩ মিলিয়ন টন দিয়ে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন (অনধিক ৫০০ মেগা ওয়াট) ও অন্যান্য চাহিদা (ইটের ভাটার ব্যবহার) পূরণ করা হবে (AEC 2004b)। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরিবর্তে রপ্তানির মাধ্যমে অধিক আয়ের লক্ষ্যেই অগ্রসর হয় এশিয়া এনার্জি।[৬] জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পেয়ে ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে এ মাপের উন্মুক্ত খনি করার লক্ষ্যে এশিয়া এনার্জি ২ বছর মেয়াদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শুরু করলেও দ্রুত (২০০৭ সালের মধ্যেই) কয়লা উত্তোলন শুরু করার জন্য ১ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এসব সমীক্ষা শেষ করে ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য জমা দেয় (AECB 2006)। অন্যদিকে খনি উন্নয়নের জন্য পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডন স্টক একচেঞ্জে অধিভুক্ত হয় এশিয়া এনার্জি'র প্যারেন্ট কোম্পানি এশিয়া এনার্জি পিএলসি, যা বর্তমানে জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসি নামে পরিচিত (AEC 2004a, জিসিএম ২০১০)।

এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনি উন্নয়নের প্রস্তাবে যেসব দিক উল্লেখ করে[৭] তাকে 'পিছিয়ে থাকা' উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা নিম্নরূপ:

---

[৫] বিশেষজ্ঞ কমিটির এক সদস্যের সাথে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে আলাপ করে এটি জানতে পারি।

[৬] ২০১২ সালের শেষের দিকে এশিয়া এনার্জি জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে নতুন প্রস্তাব দেয় যাতে ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব করা হয় (প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০১২)। ২০১৩ সাল থেকে এশিয়া এনার্জি প্রচার শুরু করে যে, ফুলবাড়ী খনি থেকে ৪,০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। ২০১৭ সালে এসে এটি ৪,০০০-৬,০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত হতে পারে বলে উল্লেখ করে এশিয়া এনার্জি (দেখুন এশিয়া এনার্জির বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২ থেকে ২০১৭)।

[৭] সব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এশিয়া এনার্জি প্রণীত 'স্যোশাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট স্টাডি' র প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড দেখুন।

প্রথমত, উন্মুক্ত পদ্ধতির খনির মাধ্যমে মজুদ কয়লার বেশির ভাগ উত্তোলন করা যায়; অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে এর ১০-২০ ভাগ কয়লা উত্তোলন করা যায়। তাই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের জন্য উন্মুক্তখনি করাই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়ত, রপ্তানিমুখী খনি প্রকল্প হবার কারণে সরকার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে এবং এতে 'ব্যাল্যান্স অব পেমেন্ট' নিয়ে সরকারের আর্থিক দুশ্চিন্তা লাগব হবে।

তৃতীয়ত, এশিয়া এনার্জি কয়লাখনি ও সংলগ্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার এবং ৩৫ বছরের অধিক সময় খনি চালাতে আরও ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে; এর ফলে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে। এ বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে খনির মেয়াদকালে বাংলাদেশের সরকার নিজস্ব কোনো বিনিয়োগ না করেই মোট ২১ বিলিয়ন ডলার আয় করবে (যার ৭.৮ বিলিয়ন প্রত্যক্ষ আয় আর বাকিটা পরোক্ষ আয়)। প্রত্যক্ষ আয়ের মধ্যে আছে খনি কোম্পানির আয় থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স (শতকরা ৪৫ ভাগ) বাবদ ও কয়লার রয়্যালটি (শতকরা ৬ ভাগ) বাবদ পাওয়া অর্থ।এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বার্ষিক শতকরা ১ ভাগ (০.৭ বিলিয়ন ডলার) যুক্ত হবার কারণে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবে।

চতুর্থত, খনিমুখে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরকার অনধিক ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ (প্রথমে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কেন্দ্র যা পরে আরও ৫০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে) পাবে যা জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে ও দেশের অন্যান্য এলাকায় শিল্প কারখানার উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। এর ফলে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য গ্যাসের উপরও চাপ কমবে।

পঞ্চমত, খনি থেকে স্থানীয় কয়লার সরবরাহ তৈরি হলে দেশের ইট ভাটায় ব্যবহৃত কয়লা (প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন টন) আমদানি করতে হবে না বিধায় খনির জীবনকালীন প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।[৮]

এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত খনির প্রস্তাবের শুরু থেকেই এর কারিগরি দিক নিয়ে বাংলাদেশে জনপরিসরে গত এক দশকে ব্যাপক আলোচনা/বিতর্ক হয়েছে। এ আলোচনা দেশের জ্বালানি ও খনি বিশেষজ্ঞদের দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এক পক্ষের মতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত খনিই করা দরকার। এ পক্ষের সাথে আরও যুক্ত আছেন বাংলাদেশের আমলা, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী এলিট মহল। তাঁদের প্রধান যুক্তি বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা নিরসনে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতা হেতু বিকল্প উৎস হিসেবে স্থানীয় কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের দিকে নজর

[৮] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এশিয়া এনার্জি প্রস্তাবিত খনি প্রকল্পের এসব দিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক অভিঘাত নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার কোনো স্বাধীন পর্যালোচনা করেনি। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০৫-২০০৬ সালে টাটার ২.৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়েও বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়; এ নিয়ে প্রবল বিরোধিতাও তৈরি হয় (জাতীয় কমিটি, ২০০৬)। বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোডের অনুরোধে একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ এ নিয়ে স্বাধীন পর্যালোচনা করে কোম্পানির প্রচারিত বাংলাদেশের লাভের হিসেবে, যা 'দ্য ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' তৈরি করেছে, তাতে নানা গলদ চিহ্নিত করেছেন (Mahmud, ২০০৬)। তেমন একটা উদ্যোগ ফুলবাড়ীর ক্ষেত্রে নেয়া যেতে পারে। যদিও ২০০৬ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এশিয়া এনার্জির সমীক্ষার যে মূল্যায়ন করে, তাতে অর্থনৈতিক বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত।

দেয়া দরকার। তাই ফুলবাড়ী এবং পরবর্তীতে বড়পুকুরিয়া থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতির খনির মাধ্যমে ব্যাপক কয়লা উৎপাদন করা দরকার। অন্য পক্ষের মতে কারিগরি দিক থেকে উন্মুক্ত খনি বাংলাদেশে করা সম্ভব নয়; এতে অনেক ঝুঁকি আছে এবং আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনা করলে তা ক্ষতিকর হবে। এ দলের সাথে আরও যুক্ত আছেন স্থানীয় ও জাতীয় পরিসরে 'খনিবিরোধী'[৯] আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকগণ। তাঁদের মতে কৃষিজমি নির্ভর বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার স্থায়ী ক্ষতিকে গুরুত্ব দেয়া দরকার। বাংলাদেশের মতো একটা ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি অঞ্চলে উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি তৈরি করলে যে বহুমাত্রিক প্রভাব দেখা দিবে তা এশিয়া এনার্জি এড়িয়ে গেছে বলেও তাঁদের অভিযোগ আছে। এখানে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেন তাঁরা: কৃষি উৎপাদন ও ভূ-অভ্যন্তরের পানির প্রবাহে খনির ফলে সৃষ্ট অভিঘাত। এসব সমালোচনার যথার্থতা দেখা যায় ২০০৬ ও ২০১২ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দুটো বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনে; উভয় কমিটি এশিয়া এনার্জির প্রকল্প নিয়ে আরও সমীক্ষা ও পর্যালোচনার সুপারিশ করেছেন।[১০] ২০১৫ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় খনি কোম্পানির 'একদল আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা তৈরি' সম্ভাব্যতা সমীক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ চিহ্নিত করে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরকে আবার সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেয়।[১১] ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের পরিচালক এর আগেই ২০১২ সালে মন্তব্য করেছেন যে এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবে অনেক 'অসঙ্গতি' আছে এবং কোম্পানি তার সমীক্ষায় নানা 'কাল্পনিক' তথ্য পরিবেশন করেছে (জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই ২০১২, শেষের পাতা)। ২০১৫-২০১৬ সালে ব্যাপক সমীক্ষা করে তাঁরা আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনায় ফুলবাড়ী ও বড় পুকুরিয়া অঞ্চলে উন্মুক্ত খনি করা যাবে না বলে জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে।[১২] এর ফলে ২০০৫ সালে উত্থাপিত ফুলবাড়ীর স্থানীয় জনগণের ও খনিবিরোধী অন্যান্য কর্মী ও সংগঠকদের দাবীর যথার্থতা ফুটে উঠল।

---

[৯] 'খনিবিরোধী' অভিধাটি যথার্থ না হলেও আলোচনার সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় পরিসরে যারা এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তাঁরা নিজেদের 'খনিবিরোধী' বলে মানতে নারাজ। তাঁদের দাবী তাঁরা কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে নন। তাঁরা কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাবিত পদ্ধতি (উন্মুক্ত পদ্ধতি), উত্তোলিত কয়লার ব্যবহার (শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানি) এবং কয়লা খনির মালিকানা (রাষ্ট্রের বদলে বহুজাতিক কোম্পানি) নিয়ে বিরোধিতা করছেন; কোনো মতেই তাঁরা খনির বিরোধী নন।

[১০] বেসরকারি সুত্র থেকে এ কমিটি দুটোর প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে; তাই উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

[১১] ২০১২ সালের বিশেষজ্ঞ কমিটি এশিয়া এনার্জির সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনেক ত্রুটি চিহ্নিত করে; কমিটির মতে, ফুলবাড়ী খনি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কৃষি উৎপাদনের ক্ষতির সাথে কয়লা উত্তোলনের লাভ এবং ভূগর্ভস্থ পানি অনবরত উত্তোলনের ফলে খনি সংলগ্ন অঞ্চলে কৃষি ও স্থানীয় পরিবেশের উপর যে প্রভাব পড়বে তা নিয়ে স্বাধীন সমীক্ষার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে।

[১২] দেখুন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নথি (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত) এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫-২০১৬। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, দিনাজপুর অঞ্চলে কি ধরনের কয়লা খনি করা যাবে সে বিতর্কের অবসান হয়েছে ১৯৯০ সালে যখন সরকার নিয়োগকৃত ব্রিটিশ নির্মাণ ফার্ম বড়পুকুরিয়ার ব্যাপক সমীক্ষা করে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির খনি করার সুপারিশ করে এবং সরকার তাই গ্রহণ করে। সেসময় উন্মুক্ত খনি করার প্রস্তাব বাতিল করা হয় বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে। একই ভূতাত্ত্বিক এলাকায় যদি সেসময়ে উন্মুক্ত খনির প্রস্তাব নাকচ হয় কারিগরি কারণে তাহলে এখন কেন এশিয়া এনার্জি তা করতে আগ্রহী এবং এতে সরকারের সায় আছে তা নিয়ে সরকারি দলিলে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Imam (2013)।

## ৩। জ্বালানি নিরাপত্তায় স্থানীয় কয়লা

২০০৫ এর শুরু থেকেই বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় কয়লা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে বলে সরকারি দলিল দস্তাবেজে, খনি কোম্পানি ও কয়লা লবিস্টদের নানা বয়ানে ও জনপরিসরে জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় ফুটে উঠে। এঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দাপুটে বয়ানের মূল বক্তব্য হচ্ছে: বাংলাদেশে পাঁচটি কয়লাক্ষেত্রে ৩ বিলিয়ন টনের বেশি কয়লা মজুদ আছে। এ কয়লা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায় অনেকে আক্ষেপ করে বলেছেন, এত সম্পদ মাটির নিচে পড়ে আছে, অথচ বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারছে না। ২০০৫-২০১৭ সময়কালে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়লা উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশির ভাগ খবরে উল্লেখ করা তথ্যের সারমর্ম এরূপ: 'বাংলাদেশে কয়লার মজুদ প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন টন। এত বিশাল আকারের মজুদ থেকে কয়লা উন্নয়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট মোচন সম্ভব'। এ বক্তব্যের মূল ভিত্তি কারিগরি দিক থেকে কয়লা উত্তোলন বিষয়ক চিন্তা। কিন্তু কয়লা উত্তোলন শুধুমাত্র কারিগরি বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, এর সাথে জটিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় দিকের সমন্বয় করেই এ বিষয়ে নির্মোহ আলোচনা/বিতর্ক হওয়া উচিত।

জ্বালানি মন্ত্রণালয় সুত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ৫টি আবিষ্কৃত কয়লা খনি আছে (সারণি ১)।

**সারণি ১: বাংলাদেশের কয়লা খনিসমূহ**

| খনির নাম (আবিষ্কার সাল) | কয়লার গভীরতা (মিটার) | কয়লার মজুদ (মিলিয়ন টন) |
|---|---|---|
| জামালগঞ্জ (১৯৬২) | ৬৪০ | ১০৫৩ |
| বড়পুকুরিয়া (১৯৮৫-১৯৮৭) | ১১৮ | ৩৯০ |
| খালাসপীর (১৯৮৯-১৯৯০) | ২৫৭ | ৬৮৫ |
| দিঘীপাড়া (১৯৯৪-১৯৯৫) | ৩২৮ | ৬০০ |
| ফুলবাড়ী (১৯৯৭) | ১৫০ | ৫৭২ |

**উৎসঃ** পরিকল্পনা কমিশন,ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), ভলিউম-২, পৃ ১৫৪।

উপরের এ হিসাবে 'মজুদ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এটা কি 'প্রমাণিত' মজুদ নাকি 'সম্ভাব্য' মজুদ, নাকি 'উত্তোলনযোগ্য' মজুদ তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের হিসাব[১৩] অনুযায়ী কয়লার 'প্রমাাণিত' মজুদের হিসাব এরকম: বড়পুকুরিয়ায় ৩০০ মিলিয়ন টন, খালাসপীরে ১৪৩ মিলিয়ন টন ও দিঘীপাড়ায় ১৫০ মিলিয়ন টন। জামালগঞ্জে কয়লার পরিমাণ উপরের সারণিতে দেয়া তথ্যের মতোই আছে। এ প্রতিবেদনে ফুলবাড়ী সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই; কেননা ঐ খনি ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তর আবিষ্কার করেনি। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত বাংলাদেশ 'কয়লা নীতি'র চতুর্থ ভার্সনের পরিশিষ্টে ১৮ জুলাই ২০০২ সালে জ্বালানি সচিব বরাবর

[১৩] "মিনারেল ডিপোসিট অব বাংলাদেশ" শীর্ষক এক প্রতিবেদন (যা বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে)।

লিখিত বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন যুক্ত করা হয়। তাতে কয়লার 'প্রমাণিত' মজুদের হিসাব এরকম: জামালগঞ্জে ১০৫৩ মিলিয়ন টন, বড়পুকুরিয়ায় ৩০০ মিলিয়ন টন, খালাসপীরে ১৪৩ মিলিয়ন টন এবং ফুলবাড়ীতে ৪০০ মিলিয়ন টন। দিঘীপাড়া নিয়ে কোনো তথ্য নেই; কেননা সেখানে ঐ সময়ে মজুদ নির্ধারণের কাজ চলছিল। ২০০৪ সালে প্রণীত জাতীয় জ্বালানি নীতির খসড়ায় (পৃ ৯) বলা হয়েছে, ফুলবাড়ী খনিতে 'প্রাথমিক' মজুদ আছে ৪০০ মিলিয়ন টন; আর এ থেকে 'উত্তোলনযোগ্য' মজুদের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টন । দেখা যাচ্ছে, উপরের সারণিতে ফুলবাড়ী খনি সম্পর্কে দেয়া তথ্যের সাথে জ্বালানি নীতিতে উল্লেখিত তথ্যের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। জ্বালানি নীতির খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন খনিতে থাকা কয়লার মধ্যে ৪৯২ মিলিয়ন টন 'উত্তোলনযোগ্য'। তাহলে দেখা যায় ৩.৩ বিলিয়নের মধ্যে মাত্র ৫০০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনযোগ্য । ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে পাটোয়ারী কমিটি কর্তৃক প্রণীত কয়লা নীতি বিষয়ক প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেয়া তথ্য অনুযায়ী 'প্রমাণিত' মজুদের পরিমাণ এরূপ: বড়পুকুরিয়া ৩০৩ মিলিয়ন টন, খালাসপীর ১৪৩ মিলিয়ন টন, দিঘীপাড়া ১৫০ মিলিয়ন টন এবং ফুলবাড়ী ২৮৮ মিলিয়ন টন। এতে জামালগঞ্জ খনি নিয়ে কোনো তথ্য নেই। সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়া যায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স এর তৈরি করা ২০১৬ সালের 'জ্বালানি নিরাপত্তা সমীক্ষায় (পৃ. ৬৭)। এতে কয়লার মজুদ (কি ধরনের মজুদ তা বলা নেই) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে: জামালগঞ্জ ১০৫৩.৯০ মিলিয়ন টন, বড়পুকুরিয়া ৪০০ মিলিয়ন টন, খালাসপীর ৫২৩.৪৯ মিলিয়ন টন, দিঘীপাড়া ৬০০ মিলিয়ন টন এবং ফুলবাড়ী ৫৭২ মিলিয়ন টন। আবার প্রমাণিত মজুদই শেষ কথা নয়। প্রমাণিত মজুদ থেকে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা যাবে তা নির্ভর করে মাইন পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের উপর। বাংলাদেশ কয়লা নীতির চতুর্থ ভার্সনের পরিশিষ্টে দেয়া তথ্য অনুযায়ী 'উত্তোলনযোগ্য' কয়লার পরিমাণ এরূপ: জামালগঞ্জ ১২০ মিলিয়ন টন, বড়পুকুরিয়া ৬৪ মিলিয়ন টন, খালাসপীর ১৪ মিলিয়ন টন, দিঘীপাড়া ৪০ মিলিয়ন টন এবং ফুলবাড়ী ২৯৮ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে ফুলবাড়ী ছাড়া বাকিগুলোকে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির খনি হিসেবে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিবেদনে প্রমাণিত, সম্ভাব্য ও উত্তোলনযোগ্য মজুদ নিয়ে কোনো সামঞ্জস্য নেই। জ্বালানি নিরাপত্তায় স্থানীয় কয়লার ব্যবহার নিয়ে আলোচনার শুরুতে এর সুরাহা হওয়া দরকার।

এরূপ তথ্য বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে জ্বালানি নিরাপত্তায় স্থানীয় কয়লার ব্যবহার সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা বেশ গোলমেলে। উদাহরণ স্বরূপ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কয়লা মজুদ থাকা জামালগঞ্জ খনির কথাই ধরা যাক। সরকারি দলিল অনুসারে এ খনিতে ৬৪০-১,০৫৮ মিটার গভীরতায় ১,০৫৩ মিলিয়ন টন কয়লা আছে। উন্মুক্ত কিংবা ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির কোনো প্রয়োগ করে এ খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা যাবে না; তবে অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতিতে কয়লা থেকে গ্যাস উত্তোলন করা যেতে পারে বলে বাংলাদেশের ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞগণ অনেকদিন থেকেই বলে আসছিলেন। ফুলবাড়ীতে ২০০৫-২০০৬ সালের গণআন্দোলনের দরুন কয়লা উত্তোলনে বাধা তৈরি হবার পরে জ্বালানি মন্ত্রণালয় জামালগঞ্জ খনির দিকে আগ্রহী হয়। জ্বালানি মন্ত্রণালয় আশাবাদী হয়ে সম্প্রতি ভারতীয় এক কোম্পানিকে নিয়োগ করেছিল জামালগঞ্জ কয়লাখনি থেকে কোল-বেড মিথেন গ্যাস পাওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে ঐ কোম্পানি জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে যে, জামালগঞ্জ কয়লা খনিতে উত্তোলনযোগ্য কোনো কোল-বেড মিথেন গ্যাস নেই (নিউ

এজ, ১৭ নভেম্বর, ২০১৬)। ফলে জামালগঞ্জ খনির ১ বিলিয়ন টনের বেশি কয়লা কোনো কাজেই ব্যবহার করা যাবে না। তাই জামালগঞ্জ খনি খনিজসম্পদের ও জ্বালানি নিরাপত্তায় স্থানীয় কয়লার ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্ত হিসাব-নিকাশ থেকে বাদ পড়ার কথা।

## ৪। স্থানীয় মানুষের খনি বিরোধী প্রতিবাদের ভাষা

২০০৫ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ফুলবাড়ী অঞ্চলে কয়লা খনির বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আন্দোলনের মুখে ফুলবাড়ী শহর অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় এশিয়া এনার্জি কোনো ধরনের জরিপ কাজ পরিচালনা করতে পারেনি। এশিয়া এনার্জির মতে কয়লা অঞ্চলের শতকরা ৭৪ ভাগ মানুষ তাদের প্রকল্পকে সমর্থন করেছে যদি যথার্থ ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয় (AECB 2005)। তাদের এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে যার দরুন গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। ২০০৬ সালের জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কয়লা অঞ্চল সফর করে স্থানীয় মানুষের সাথে আলোচনা করে এশিয়া এনার্জির এ দাবীর সত্যতা খুঁজে পাননি।

'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে স্থানীয় মানুষ সংগঠিত হয় ২০০৫ সালের জুন মাসে । এর আগে স্থানীয় এক রাজনৈতিক সংগঠন (জাতীয় কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি) ও সামাজিক সংগঠন (ফুলবাড়ী কমিউনিটি কাউন্সিল) এপ্রিল মাসে খনির বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হবার আহবান জানায়। ফুলবাড়ী কমিউনিটি কাউন্সিল এশিয়া এনার্জি ও বাংলাদেশ সরকারের নানা দফতরে এক স্মারকলিপি পাঠায়। এঁদের সবার মূল দাবী যে তাঁরা বাস্তুভিটা, কৃষি জমি, বাপ দাদার কবর, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো ধ্বংস করে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা খনি চায় না।[১৪] খনি বাতিলের দাবি জানিয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী'র কাছে স্মারকলিপি দেয়া সহ হরতাল, মানব বন্ধন, মিছিল, সমাবেশ করেছে ১ বছরের অধিককাল ধরে ।

২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে এশিয়া এনার্জির কয়েকজন কর্মকর্তা ফুলবাড়ী মেয়রের অফিসে খনি নিয়ে আলোচনা করে এর সুফল তুলে ধরেন। উপস্থিত স্থানীয় এলিটদের মধ্যে উন্মুক্ত খনি নিয়ে যেসব প্রশ্ন জাগে তার সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে তাঁরা খনিবিরোধী আন্দোলনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁদের চিন্তার বিষয় ছিল যে, বাংলাদেশের মতো অল্প জমির দেশে কোথায় এত মানুষকে (প্রায় ৪০,০০০) পুনর্বাসন করা হবে? জমির অভাবহেতু এই পুনর্বাসিত মানুষদের জীবিকার কি হবে? বিশাল এলাকার জমি হারিয়ে (৬,০০০ হেক্টর) জমি নির্ভর মানুষের জীবিকার কি হবে?[১৫] উন্মুক্ত খনির

---

[১৪] দেখুন ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির লিফলেট'আহবান' (জুন ২০০৫); প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরিত স্মারকলিপি (১৮ জুন ২০০৫)।

[১৫] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জমির পরিমাণ ও উচ্ছেদ হতে হবে এরকম মানুষের সংখ্যা নিয়ে এশিয়া এনার্জি সঠিক তথ্য সরকারকে দেয়নি বলেই মনে হয়। খনির ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৭৮.৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা (কয়লা মজুদের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ৫ কিলোমিটার এলাকা); জমির পরিমাণের হিসাবে তা ৭,৮০০ হেক্টরের বেশি। এর সাথে যুক্ত হবে খনির নানা অবকাঠামো ও ফুলবাড়ী শহর প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত জমি। ২০০৬ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিও জমির পরিমাণ নিয়ে অস্বচ্ছতা চিহ্নিত করেন। এ কমিটি ২০০১ সালের শুমারির আলোকে হিসাব

ফলে ঐ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের ব্যাপক মাত্রায় যে ক্ষতি হবে এবং কয়লা তোলার জন্য ভূঅভ্যন্তরের পানি উঠিয়ে ফেলার দরুন ৩১৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকার (কয়লা মজুদের কেন্দ্র থকে চারিদিকে ১০ কিলোমিটার এলাকা) বিশাল জনগোষ্ঠীর কৃষিকাজসহ প্রাত্যহিক নানা কাজে পানির চাহিদা পূরণ যে ব্যাহত হবে তা নিয়ে এশিয়া এনার্জির কর্তাব্যক্তিগণ তাঁদের সদুত্তর দিতে পারেননি।[১৬]

এখানে উল্লেখ যে, ফুলবাড়ীর মানুষ জমিজমা ও বাস্তুভিটা হারিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে উচ্ছেদ হতে মোটেও আগ্রহী নয়; খনি অঞ্চলের যে কোনো প্রান্তে এ ভাবনা একই রকম। এশিয়া এনার্জি নানা আকর্ষণীয় প্রস্তাব প্রচার করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের (আধুনিক মডেল টাউন) প্রতিশ্রুতি দিলেও কৃষিজীবি পরিবারের মানুষ পুনর্বাসিত টাউনের বদ্ধ কাঠামোয় স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবেন না বলেই মত দেন। যেমন: এক সম্পন্ন কৃষক বলেন:

> *আমার ৫০-৬০ বিঘা জমি আছে; আমি এলাকার একজন সম্মানী মানুষ। নানা কাজে মানুষ আমার কাছে আসে ও উপকৃত হয়। পুনর্বাসিত অঞ্চলে আমি কি এ সম্মান পাবো? আমার বাড়িতে বড় বড় চার খানা ঘর আছে; এসব সারা বছর নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আমার এই বিশাল পরিবার নিয়ে এক-দুই কামরার আধুনিক বাড়ীতে কিভাবে বাস করব? আমাকে কয়েক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেও আমি এই পরিমাণ জমি কোথায় পাব? জমি পেলেও আমি কি এই পরিমাণ জমি ঐ টাকায় কিনতে পারব? আরেকটা কথা, বাস্তু ভিটা ও কৃষি জমি হারিয়ে আমিতো 'উদ্বাস্তু' হয়ে গেলাম; 'উদ্বাস্তু'কে কেউ সম্মান দেয় না। গুচ্ছ গ্রামে 'উদ্বাস্তুর' জীবন সম্মানের জীবন নয়।*

উপরের উক্তিতে আর্থিক বিষয়ের সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় জড়িয়ে আছে যা নিয়ে খনি কোম্পানির বাচনে এলাকার মানুষ সন্তুষ্ট হয়নি। আরেক কৃষকের বক্তব্য ঢাকার এলিট মহলের চিন্তার গভীরতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাঁর মতে,

> *আমার জমিতে আমি বছরে দুই ফসল ফলাই; দুটি ধানের আবাদ করি। যে ধান পাই তার কতটুকু আমার নিজের লাগে? সামান্য অংশই লাগে। বাকিটা তো বাজারে বিক্রিই করি। আমাদের ঐ ধান সারা দেশে যায়।এ এলাকা ধানের জন্য বিখ্যাত; এর ধান সারা দেশে না গেলে অনেক মানুষের ধানের চাহিদা মিটবে না। আমাদের এই ধানি জমি কেয়ামত নাগাদ ফলন দেবে; এর ফল সারা দেশের মানুষ ভোগ করে। দেশের বড় বড় নেতারা ঢাকায় বসে কি চিন্তা করে আমি ভেবে পাই না। এত ধানের যোগান নষ্ট করলে কি অবস্থা হবে?*

---

করেন যে, প্রত্যক্ষভাবে ৫০,০০০ এর অধিক এবং পরোক্ষভাবে ২২০,০০০ মানুষ খনির কর্মকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সংখ্যা এখন আরও বেশি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেখকের নিজের হিসাবেও দেখা গেছে, এশিয়া এনার্জি প্রদত্ত সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা খনি কোম্পানির খরচ কমানোর এবং নীতি নির্ধারকদের সম্মতি আদায়ের একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। স্থানীয় আন্দোলনকারীদের মতে আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সময়ে সময়ে এশিয়া এনার্জি এসব হিসাব-নিকাশ পাল্টে ফেলেছে। খনি কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হয়নি বলে এসব বিষয় যাচাই করা যায়নি।

[১৬] মাঠ গবেষণায় ঐ সভায় উপস্থিত কয়েকজনের সাথে আলাপের ভিত্তিতে এটা জানা যায়।

এখানে দেখা যায় ধান বনাম কয়লা নিয়ে স্থানীয় মানুষদের পরিষ্কার ভাবনা আছে। এশিয়া এনার্জি'র দলিল দস্তাবেজে ধানের ক্ষতি নিয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই বলে ২০০৬ ও ২০১২ সালের দুটি সরকারি বিশেষজ্ঞ কমিটি চিহ্নিত করেছেন। শুধু ধানের জমি ও বসতভিটা হারানো নয়, গ্রামের মানুষের কাছে তাঁর বাপ-দাদার কবরের গুরুত্ব অপরিসীম; খনিবিরোধী মনোভাব তৈরিতে এসব সাংস্কৃতিক উপাদানও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। একদল গ্রামবাসীর সাথে দলগত আলোচনায় জানতে চাওয়া হয়েছিল আসলে এশিয়া এনার্জির খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে কেন এত ক্ষোভ। জমিজমা হারানোর কথাকে একটু সরল করে বলা হলো যে অর্থের বিনিময়ে অনেক এলাকায় তো 'উন্নয়ন' প্রকল্পের জন্য মানুষকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে এবং মানুষ রাজীও হচ্ছে। একজন বয়স্ক মানুষ ক্ষোভের সহিত বলে উঠলেন:

> *আমার জমিজমা ও বসতের চেয়েও দামী সম্পদ আছে; তার কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না; কেউ সেটা দিতে পারে না। সেটা আমার বাপ-দাদাসহ গোষ্ঠীর সকলের কবরস্থান। এ গ্রামে আমাদের নাড়ীর সম্পর্কের সূত্র এই কবরস্থান। আমার নাম পরিচয় যে কেউ শনাক্ত করতে পারে ঐ বংশ সুত্র ধরে। এটা হারালে আমার নাম পরিচয়ই শেষ। কোথায় পাবো এটা?*

খনি অঞ্চলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকায় এমন দুটি জনগোষ্ঠীর বাস যারা উচ্ছেদকে তাঁদের মৃত্যু হিসেবেই বিবেচনা করছে। এর একটি হচ্ছে বেশ কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় যারা ঐ অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে নানা প্রক্রিয়ায় জমি হারিয়ে ও বঞ্চনার শিকার হয়ে এখন বেশ প্রান্তিক মানের জীবন যাপন করছে (সরেন, বোরহান ও সুমন ২০১৪)। এরকম এক সম্প্রদায়ের স্থানীয় এক প্রবীণ নেতা বলেন:

> *খনি কোম্পানির লোকজন আমাদের গ্রামে কয়েকবার এসেছে; খনি সম্পর্কে নানা কথা শুনিয়েছে আমাদের। আমাদের ব্যাপক উন্নতি হবে বলে নানা লাভের আশা দেখিয়েছে। আমিসহ এলাকার সবাই আমরা সব সময় বলেছি যে জমি জমা ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। যত বারই এসেছে ততবারই একই কথা বলেছি। আমাদের এ অবস্থানের নড়ছড় হয়নি।*

আরেক আদিবাসী ব্যক্তি (যিনি আদিবাসী অধিকার বিষয়ক একজন কর্মী) বললেন,

> *খনি হলে আদিবাসী মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না; দেশে দেশে যেখানেই খনি হয়েছে সেখানকার আদিবাসী ধ্বংস হয়ে গেছে। ভারতের ঝাড়খন্ডের উদাহরণ দেখেন, সেখানে আদিবাসী মানুষ কুকুর বিড়ালের মতো বাস করছে। আদিবাসী মানুষ সম্প্রদায়গতভাবে একত্রে বাস না করলে বাঁচবে না। খনি হলে তো আমাদের জোর করে তাড়িয়ে দেবে। আমরা প্রান্তিক মানুষ লড়াই করে পারবো না; বাঙালিরা সব কেড়ে নেবে। ক্ষতিপূরণের কানাকড়িও পাব না।*

খনির বিরুদ্ধে আদিবাসীদের অবস্থান তাঁদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফল। উত্তরাঞ্চলে আদিবাসীদের নানা ধরনের শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্য ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবে তাঁদের যেন

'নিজভূমে পরবাসী'করে ফেলেছে (কামাল, চক্রবর্তী ও নাসরিন ২০০৬)। আর্থিক ক্ষতিপূরণের মানদণ্ডে তাঁদের খনিবিরোধী মনোভাবকে পরিমাপ করা যাবে না। খনি কোম্পানি তাই করেছে। আদিবাসী ইস্যুতে খনি কোম্পানির আরেকটি পদক্ষেপ তাঁদের খনিবিরোধী মনোভাবেকে বেশ জোরালো করেছে। এশিয়া এনার্জি'র হিসাব মতে কয়লা খনির ফলে মাত্র ২,৩০০ আদিবাসীকে উচ্ছেদ হতে হবে। ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় ঐ অঞ্চলে মোট ১৭,০০০ আদিবাসী বাস করেন।[১৭] আদিবাসী অধ্যুষিত এক ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামেই ২০১১ এর হিসাব অনুযায়ী ৫,৩০৯ জন আদিবাসী বাস করেন (BBS 2014)। ফলে দেখা যায়, এশিয়া এনার্জি খনি তৈরির আগেই প্রান্তিক আদিবাসীদের 'ইনভিসিবল' করে ফেলেছে। খনি শুরু হলে এঁদের কি অবস্থা হবে তা উপরের উক্তিকেই যেন সমর্থন করে ।

খনি অঞ্চলের এই এলাকায় আদিবাসীদের পাশাপাশি এক 'অভিবাসী' সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন যারা সংখ্যায় প্রায় ৫,০০০; তারা জাতিতে বাঙালি মুসলমান হলেও স্থানীয় মানুষদের সাথে তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব আছে। স্থানীয় মানুষ তাঁদের নানাভাবে ব্যঙ্গ করে, অপমানজনক নামে ডাকে, এবং সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলেন। এঁরা চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় জমিজমা হারিয়ে ১৯৭১ পরবর্তীকালে এ এলাকায় এসে বন বিভাগের জমি দখল করে তা কেটে ধানী জমি ও বসতভিটা তৈরি করেছেন। চার যুগের বেশি সময় ধরে 'চেইন মাইগ্রেশন' এর সূত্রে ঐ অঞ্চলের মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছেন এবং একটা 'এনক্লোসড কমিউনিটি' এর মতো বাস করে। এঁদের বেশিরভাগের জমিজমার কোনো সত্ত্ব নেই; যাদের আছে তাও অবৈধ উপায়ে সংগ্রহ করা। হরহামেশাই বন বিভাগের লোকজন এসে তাঁদের খবর দেয় জমির কাগজপত্র নিয়ে দেখা করার জন্য। এঁদের মধ্যে উচ্ছেদের আতঙ্কজনিত কারণে খনিবিরোধী মনোভাব বেশ প্রবল। এ গ্রামের একজন মাদ্রাসা শিক্ষক যিনি আবার জমিজমায় চাষের কাজও করেন খনিবিরোধী আন্দোলন নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে বলেন:

> *৪০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আমরা এ এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছি। এলাকার স্থানীয় মানুষ আমাদের কোনো দাম দেয় না। বিয়ে শাদিতে আগ্রহী হয় না। এখন অনেক দিন পরে সম্পর্কের একটু উন্নতি হচ্ছে। এটা ৪০ বছরের মেলামেশার ফল। এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কোথায় গিয়ে আবার বাস করব? এক অনিশ্চিত জীবনের মুখে আমাদের ঠেলে দেওয়া হবে। আমাদের যেহেতু জমির স্বত্ত্ব নেই তাই আমরা কোনো ক্ষতিপূরণ পাব না। খনি কোম্পানি যদিও বলেছে আমরাও ক্ষতি পূরণ পাবো, আমরা এটা বিশ্বাস করিনি। ভূমি অফিস থেকে যাদের অরিজিনাল কাগজপত্র থাকে তাদেরই শুধু ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়; তা আমরা জানি। খনি কোম্পানি আমাদের সান্তনা দিতে ঐসব বলেছে। খনি হলে আমরা আবার উদ্বাস্তু হব। একবার উদ্বাস্তু হয়ে একটা সমাজ গড়তে ৪০ বছরে*

[১৭] স্থানীয় আদিবাসী নেতাদের মতে এ সংখ্যা ভ্রান্ত; কেননা সরকারি শুমারির সময় গণনাকারীগণের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অনেক আদিবাসীকে অন্য ধর্মের মানুষদের কাতারে ফেলা হয়। ফলে আদিবাসীর সংখ্যা কমে যায়। তাঁদের দাবি খনি এলাকার ৬৭ আদিবাসী গ্রামে প্রায় ৫০,০০০ আদিবাসী বাস করে। সরকারি দলিল দস্তাবেজের আলোকে এটি যাচাই করা যায়নি।

*লেগেছে। এবার খনির কারণে উচ্ছেদ হলে আমার বাকি জীবনে আর সমাজবদ্ধ জীবনে বাস করতে পারব না।*

ফলে দেখা যায় কয়লা খনি তৈরির ক্ষেত্রে আর্থিক দিকই মূল বিষয় নয়; খনি অঞ্চলের মানুষের জমিকেন্দ্রিক জীবন, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি-এসবের নানামাত্রিক ভাবনা তাঁদের উচ্ছেদ আতঙ্ককে এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আরেক গ্রামে এ নিয়ে আলাপ করতে যাবার পথে একজন সম্পন্ন কৃষক অপরিচিত মনে করে আমার ঐ এলাকায় যাবার কারণ জেনে ক্ষোভ দমাতে না পেরে বলেন:

*আমাদের বানানো সরকার যদি আমাদের কথা না শুনে বিদেশী এক কোম্পানির কথাই শুধু বিশ্বাস করে তাহলে খনি করার আগে আমাদের উপর থেকে বোমা মেরে ফেলে যেন মেরে ফেলে; আমরা না থাকলে তো প্রতিরোধের কেউ থাকবে না। সরকারের টাকাও দেয়া লাগবে না। আমাদের উদ্বাস্তু না করে একেবারে জানে মেরে ফেলা হোক। আর তা না করলে একেবারে রক্তারক্তি হবে। মানুষ লড়াই না করে এ জায়গা ছাড়বে না বাপু।*

এ ক্ষোভের প্রকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাজির হয় যা কয়লা খনি বিষয়ক জনপরিসরের দাপুটে আলোচনায় একেবারেই অনুপস্থিত। স্থানীয় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথাই মনে করিয়ে দেয় উপরে বর্ণিত উক্তি। 'টপ-ডাউন' পদ্ধতিতে তৈরি বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় কয়লা অঞ্চলের মানুষের অভিমত আমলে না নেবার যে প্রশাসনিক সংস্কৃতি বাংলাদেশে বিদ্যমান তাকেই প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে খনি অঞ্চলের এই প্রতিরোধ। জাতীয় কয়লা নীতির খসড়ায় একেক সময় একেক নীতি অবস্থান ব্যক্ত করা হলেও তা কয়লা অঞ্চলের মানুষের ভাবনাকে আমলে না নিয়েই করা হয়েছে ২০০৫-২০১৫ সময়কালে। অথচ স্থানীয় কয়লার ব্যবহার বাড়াতে কয়লা খনির উন্নয়ন করতে হলে তার মাশুল দিবে কয়লা অঞ্চলের জনগণ। বড়পুকুরিয়ার খনি অঞ্চলে এর নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। জমি দেবে যাওয়ায় ও ঘরবাড়ির ফাটল তৈরি হওয়ায় মানুষ প্রতিবাদ করছে। খনি অঞ্চলের প্রতিরোধের ভাষা যত্ন সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় তারা জননীতি তৈরির এই এলিট কাঠামোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। খনি অঞ্চলে এশিয়া এনার্জির প্রশ্নবিদ্ধ 'উন্নয়ন' পরিকল্পনা নিয়ে একজন কৃষি শ্রমিকের বক্তব্য এরকম:

*আমার জমিজমা নেই; আমার মতো অনেক মহিলা যাদের আপনি এই ক্ষেতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে দেখছেন তাঁদের কারো জমিজমা নেই। কিন্তু আমরা কষ্ট করে দুবেলা খেতে পারছি। অন্যের জমিতে গতর খেটে কাটিয়ে দিচ্ছি। খনি হলে এই জমিগুলো তো থাকবে না। আমাদের কাজের কি হবে? কোথায় কাজ করতে যাব? সরকার কি আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিবে? আমরা তো সরকারের কাছে কিছু চাই না। ভোটের সময় কত নেতা দেখা যায়; আর এখন আমাদের জীবন যখন যাবার লাগছে তখন কেউ নেই। সরকার কি দেখেনা যে এত মানুষের কি হবে?*

ভোট ও সরকার প্রসঙ্গে অনেক সাক্ষাৎকারে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। যেমন এক স্কুল শিক্ষকের সাথে আলোচনার সময় তাঁকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল; তিনি মনে করছিলেন যে সরকার জোর করে তাদের 'খেদিয়ে' খনি কোম্পানির জন্য মাঠ প্রস্তুত করতে পারে। পরক্ষেণই তিনি বললেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে এটা হতে পারেনা:

*এটা কেমন কথা যে জোর খাটিয়ে আমাদের খেদিয়ে দেবে। এটা তো গণতন্ত্রের দেশ;সংগ্রাম করে এদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তাহলে আমাদের কথার তো দাম দিতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের মতামতের মূল্য আছে। আমাদের অভিমত যদি খনির বিপক্ষে হয় তাহলে সরকার বা খনি কোম্পানি তো জোর খাটাতে পারে না। এই যে মানুষ মারা গেল ২৬ আগস্টে এটা তো খুব খারাপ হলো। আমরা আমাদের দাবী নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করেছি; পুলিশের গুলি চালানো কি ঠিক হয়েছে?*

এ আলোচনা শেষ করা হবে দিনাজপুর অঞ্চলের এক ব্যবসায়ী নেতার সাথে কয়লাখনি উন্নয়ন ও এর ফলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে কি অভিঘাত হবে তা নিয়ে লেখকের আলাপচারিতা দিয়ে। তাঁর মতে,

*খনির ফলে জ্বালানি সমস্যার হয়তো সমাধান হবে। আমাদের জ্বালানি সংকটের চিন্তা থেকে কয়লাখনি হচ্ছে বা হবেই-ব্যবসায়ীদের এটাই ধারণা। কিন্তু আমাদের এখানে শিল্প/কলকারখানা কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। তাই খনি করতে গেলে আমাদের যদি কৃষি জমির ক্ষতি হয়, তাহলে ক্ষুদ্র/মাঝারী যেসব শিল্প এই অঞ্চলে আছে, তা কাঁচামালের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে-এটাও আমাদের ভাবাচ্ছে।*

জানতে চাওয়া হয় কিভাবে কয়লা উত্তোলন জ্বালানি সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখবে? তিনি বললেন যে, কয়লা উত্তোলনের পর তা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হবে; বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়লে তাঁদের ঐ অঞ্চলে শ্রমভিত্তিক শিল্প হবে এবং বেকার লোকজনের কর্মসংস্থান হবে। আর উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিলে নীলফামারী ইপিজেড এর মতো শিল্পায়নও হতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের যে আকাঙ্খা তার সাথে জড়িয়ে আছে স্থানীয় উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এবার তাঁকে এশিয়া এনার্জির প্রতিবেদন (AECB 2006) থেকে কিছু তথ্য (বছরে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করে ১২ মিলিয়ন টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হবে। ৩ মিলিয়ন টন কয়লা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য রাখা হবে। প্রচলিত হিসাব মতে ৩ মিলিয়ন টন কয়লা দিয়ে ১,০০০ মেগাওয়াটের কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তবে বাংলাদেশে ইট ভাটা ও অন্যান্য কাজে প্রতি বছর প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা লাগে। সে চাহিদার কিছু অংশ মেটালে ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে) উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বললেন:

*আপনি যে পরিসংখ্যানটা দিলেন, এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে [খনি] করা ঠিক হবে না। আমার জমি ধ্বংস করলাম, পরিবেশ ধ্বংস করলাম, পানি ধ্বংস করলাম। এসব ধ্বংস করে আমি যে কয়লা পেলাম তার ১২ মিলিয়ন টন বাইরে পাঠিয়ে দিলাম! এখনতো আমরা ২৫০ মেগাওয়াট পাচ্ছি [বড়পুকুরিয়া থেকে]। এতবড় একটা ধ্বংসযজ্ঞ করে আমি মাত্র ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট পাবো-এটাতো ঠিক না। তাহলে এই চুক্তি ঠিক নেই। আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের দেশের জন্য ঠিক হয়নি। আমাদের দেশের সম্পদ আরও বেশি পরিমাণে আরেকটা খাতে ব্যবহার করতে পারি; সেখান থেকে আমাদের জিডিপিতে গ্রোথ হলো-তাহলে সেটা ঠিক আছে। আমরা শুধু বাইরে পাঠালাম, কিছু পরিমাণ ট্যাক্স পাব-আমার মনে হয় এগুলোর সংশোধন হওয়া উচিত।*

কয়লা অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের এসব অভিমত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত আলোচনায় এসবের জায়গা হয়নি। সব আলোচনা শুধু কয়লা উত্তোলনের কারিগরি দিক নিয়েই সীমাবদ্ধ। উন্মুক্ত খনি করা যাবে কি যাবে না বা কয়লা উত্তোলিত হলে দেশের জ্বালানি সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে তা এতে জায়গা পায় ২০০৫-২০১৭ সালের খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ থেকে এটি সহজেই ধরা পড়ে। তাই স্থানীয় মানুষদের এসব অভিমত থেকে ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধকে 'উন্নয়নের বলি' হবার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি এক প্রচণ্ড আঘাত হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। আন্দোলনের কর্মীদের নিচের শ্লোগান এ আঘাতকেই তুলে ধরেঃ

*'কয়লার খনি নেবে কেড়ে জমি, দেবে ভিক্ষার ঝুলি*
*আমরা মানি না মিথ্যা আশ্বাস উন্নয়নের বুলি'*

জমি-বসতভিটা-সমাজ/সংস্কৃতি কেন্দ্রিক স্থানীয় মানুষের এ নানাবিধ বোধ থেকেই কয়লা খনি বিরোধী আন্দোলনের ভাষা ও দাবী তৈরি হয়েছে, যার উপর নির্ভর করেই ২০০৫-২০০৬ সালে ফুলবাড়ীসহ আশেপাশের অঞ্চলে খনিবিরোধী প্রচারণা সংগঠিত হয়েছে। এ আন্দোলনের নানা দাবীর প্রতি বাংলাদেশের সরকার কিংবা এশিয়া এনার্জি কোনো সাড়া দেয়নি। এখনো এশিয়া এনার্জি মনে করে না যে কয়লা অঞ্চলে তার প্রকল্পের কোনো জনসমর্থন নেই।[১৮] কোম্পানির দৃষ্টিতে খনিবিরোধী আন্দোলন 'বহিরাগত' কিছু মানুষের একটা উৎপাত। কিন্তু বাস্তবতা যে ভিন্ন তা উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। খনির বিরুদ্ধে জনসমর্থনের আরও একটি মাপকাঠির কথা উল্লেখ করার মতো। ফুলবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান ও ফুলবাড়ী পৌর মেয়র (দুইবার) নির্বাচনে খনিবিরোধী সংগঠকরাই জয়লাভ করেছেন। খনিবিরোধী এই জনমত নিয়ে বাংলাদেশের একজন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বলেন:

> *এশিয়া এনার্জি নানা কারণে খনি এলাকায় মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। অবিশ্বাসের মাত্রা এত বেশি যে এখন খনি কোম্পানি প্রত্যেক পরিবারকে একটা স্বর্ণের টুকরা দিয়েও কাছে ভিড়াতে পারবে না। খনির কারিগরি দিক নিয়ে এখন আর আলাপ করে লাভ নেই। কারিগরি দিক থেকে খনি করা সম্ভব হলেও সামাজিক/রাজনৈতিক কারণে এশিয়া এনার্জি আর আগাতে পারবে না; এটি তাঁরা ভালভাবে বুঝে উঠতে পারেনি।*

[১৮] ২০১২ সালে এক জরিপ করে এশিয়া এনার্জি জানতে পারে যে, খনি অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ তাদের প্রকল্পকে সমর্থন করে; তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে খনি উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। যুক্তরাজ্য সরকারের এক তদন্ত কালে এশিয়া এনার্জি এ তথ্য প্রকাশ করেছে এবং তদন্ত দলকে এই প্রতিবেদন গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছে। এ প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে ঢাকায় এশিয়া এনার্জির অফিসে যোগাযোগ করলে কোম্পানির মিডিয়া উপদেষ্টা জানান যে, এরকম কোনো রিপোর্ট তৈরি হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই। আর রিপোর্ট থাকলেও তা গোপনীয় দলিল। জনসমর্থন পরিমাপের এই প্রতিবেদন স্বচ্ছতার খাতিরেই প্রকাশিত হওয়া দরকার। ২০১২ সালে মাঠ গবেষণার সময় কিছু দলিলপত্র (যেমন জরিপে ব্যবহৃত পূরণকৃত ও অপূরণকৃত প্রশ্নমালা; প্রশ্নমালায় গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো বক্তব্য না থাকা; খনি এলাকার একটি গ্রামের মানুষের কাছে কয়লাখনি সম্পর্কিত বিষয়ের পরিবর্তে 'ভোটার আইডি কাডের জরিপ' বলে খানার গৃহিণীদের সাথে সাক্ষাতকার বিষয়ে বর্ণনা) পাওয়া যায় যা এশিয়া এনার্জির সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষণার নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ আমলে না নেয়ায়[১৯] ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট খনি কোম্পানির অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংস ঘটনায় প্রাণহানির কারণে তৎকালীন সরকার আন্দোলনকারীদের সাথে এক সমঝোতা চুক্তি করে যাতে ফুলবাড়ীসহ বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ফুলবাড়ীতে এক সমাবেশে ঐ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে তাগিদ দেন এবং মনে করিয়ে দেন যে ঐ চুক্তি না বাস্তবায়নের 'পরিণাম হবে ভয়াবহ' (প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬, শেষের পাতা)।

ইতিমধ্যে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি (এশিয়া এনার্জির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা যাচাইয়ের জন্য) তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেন যাতে বেশ কিছু আইনি ও কারিগরি ত্রুটি উল্লেখ করে তা বাতিলের সুপারিশ করেন (নিউ এজ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (যিনি আবার জ্বালানি মন্ত্রী) এই প্রতিবেদন ও ফুলবাড়ীতে আন্দোলনকারীদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ নেবার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে নির্দেশ দেন (নিউ এজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আইন মন্ত্রণালয় আন্দোলনকারীদের সাথে সরকারের স্বাক্ষরিত চুক্তির আইনি কোনো ভিত্তি নেই বলে অভিমত দিলে (প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭) আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় (প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭)। হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারক এ মত দেন যে, সরকার যেহেতু ঐ চুক্তির অংশবিশেষ পালন করেছে তাই বাংলাদেশের চুক্তি আইন অনুযায়ী ঐ চুক্তি আইনগত বৈধতা পেয়েছে (প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭)। এরপর বেশ কয়েক বছর এ নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার। সম্ভবত এ জটিলতার কারণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বলেন যে, এখন কিংবা ভবিষ্যতে ফুলবাড়ী কয়লা খনি রাজনৈতিক বিবেচনায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না (ডেইলি স্টার, এপ্রিল ১১, ২০১০)। ২০১২ সালের নভেম্বরে এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তাগণ ২০০৬ সালের চুক্তি লংঘন করে সরকারি তৎপরতায়[২০] ফুলবাড়ীতে প্রচারণা চালাতে গেলে স্থানীয় গণপ্রতিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে সময় পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেছেন, "এশিয়া এনার্জি শুধুমাত্র সার্ভে করার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স পেয়েছে; খনি উন্নয়নের কোনো লাইসেন্স তাদের দেয়া হয়নি। তাঁর মতে, বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হবে না। যেহেতু এ প্রকল্পে বিশাল সংখ্যক মানুষ উচ্ছেদ হবে, তাই এ নিয়ে সরকার যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে দেখবে" (ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৩০ নভেম্বর, ২০১২)। এরই ধারাবাহিকতায় জ্বালানি মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের শুরুর দিকে আবার এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে (প্রথম আলো,২২ জানুয়ারি ২০১৫)।

[১৯] 'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি' প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারক লিপি দশবার প্রেরণ করলেও কোনো জবাব বা সরকারি কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

[২০] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অক্টোবর ২০১২ স্থানীয় প্রশাসনকে খনি কোম্পানিকে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাঠ গবেষণার সময় দুটি চিঠির কপি সংগ্রহ করা হয়।

যদিও ঐ চুক্তি এখনো বাতিল হয়নি, ২০১০-২০১৬ সময়কালে ধীরে ধীরে ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে সরকারের নেতিবাচক অবস্থান সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে।[২১] সরকারি বক্তব্য থেকে ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের মৃত্যু সহজেই অনুমান করা গেলেও এশিয়া এনার্জির প্যারেন্ট কোম্পানি (জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসি) ফুলবাড়ী কয়লাখনি দেখিয়েই লন্ডন স্টক একচেঞ্জের জুনিয়র মার্কেটে শেয়ার ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই আশায় যে জ্বালানি মন্ত্রণালয় শীঘ্রই তার খনি প্রকল্প অনুমোদন করবে (GCM, ২০১৬, ২০১৭)।

## ৫। কয়লা উন্নয়ন ভাবনায় কৃষি ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়লা অঞ্চলের কৃষি ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে মুখোমুখি করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বড়পুকুরিয়া খনির দিকে তাকানো যেতে পারে। খনি উন্নয়নের নানা জটিলতা পেরিয়ে ২০০৫ সালে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে এ খনি থেকে উৎপাদন শুরু হয়। শুরু থেকেই ভূমি অবনমন ঘটতে থাকে। ২০০৯ সালের দিকে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। শত শত একর ধানি জমি দেবে যায়। জীবিকার একমাত্র উৎস হারিয়ে প্রায় ১৩ গ্রামের মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। যতই খনির উৎপাদন বাড়বে ততই জমি দেবে যাবার হার বাড়বে যদিও সরকারিভাবে তা কখনো ঘোষণা করা হয়নি। এসব তথ্য জানার স্থানীয় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে শুরু থেকেই অবজ্ঞা করা হয়েছে। খনির ৩০ বছরে ৪.২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ২ মিটার পর্যন্ত তলিয়ে যাবে বলে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক সুত্র সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে (ডেইলি স্টার, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯)। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি তৈরির সময় ভূমি দেবে যাবার বিষয়টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। খনির নকশায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে খনির ব্যয় কমেছে কিন্তু এর মাশুল দিচ্ছে ভুক্তভোগী জনগণ।

---

[২১] এসময়কালে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা যায়: (১) প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে যথেষ্ট কয়লা রয়েছে। বাংলাদেশের ঘনবসতি, সার্বিক পরিবেশ, কয়লা উত্তোলনের পর ভূমি ভরাট ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' তিনি জানান, জার্মানিতে কয়লা উত্তোলন নিজ চোখে দেখার জন্য তাঁর সরকার একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। জার্মানিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন সম্ভব। কারণ সে দেশের কয়লা খনি এলাকায় খুব কম মানুষ বসবাস করে। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, 'আমাদের কয়লা খনি এলাকায় প্রচুর মানুষ বসবাস করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কথা আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।' (প্রথম আলো, ২৮ জুন, ২০১০); (২) প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কয়লা মজুদ আছে। কিন্তু এসব কয়লা উত্তোলন করতে গিয়ে অনেক লোকের প্রাণহানি হয়েছে।' তিনি বলেন, 'কয়লা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মজুদ থাকুক। ভবিষ্যতে হয়তো এমন প্রযুক্তি আসবে, যখন কয়লা উত্তোলন না করেই সেখান থেকে শক্তি ব্যবহার করা যাবে' (প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি, ২০১২); (৩) প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নীতিসংশ্লিষ্ট এক বক্তব্যে বলেন, দেশের খনিসমূহে মজুদ কয়লা বিপুল পরিসরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ (লাগসই) প্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা করা হবে। এখন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষিজমি সংরক্ষণের ওপর (প্রথম আলো, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪); (৪) প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিষয় সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন এবং আমদানি করা কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে (ডেইলি সান, ১০ এপ্রিল, ২০১৫); (৫) জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদনে সরকার আগ্রহী নয়। তিনি বলেন, সরকার ঘন জনবসতি ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে (নিউ এজ, অগাস্ট ২৪, ২০১৫); (৬) দেশের দুটি প্রধান কয়লা খনি (বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ী) থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে এসেছে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব (ডেইলি সান, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

খনি এলাকায় এর প্রভাবে কি ধরনের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা নিয়ে এ পর্যন্ত জ্বালানি মন্ত্রণালয় কোনো গবেষণা করেনি। বর্তমানের ভূগর্ভস্থ পদ্ধতির খনি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করা হবে বলে জ্বালানি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু এর ফলে ঐ অঞ্চলে কৃষি ভূমি, কৃষক-খেতমজুরের জীবন-জীবিকা, খাদ্য পরিস্থিতি ও দারিদ্র্যের উপর কেমন প্রভাব তৈরি হবে তা আমলে নেয়ার কথা শোনা যায় না।

নীতি প্রণেতাদের অনেকেই (বিশেষ করে পরিকল্পনা কমিশন) কয়লাখনি উন্নয়নকে 'ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন' এর কর্মসূচি মনে করেন।[২২] কিন্তু বাস্তব চিত্র তা সমর্থন করে না এবং সরকারি প্রতিবেদন থেকে 'ডেস্ট্রাকশন'এর নানা বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন, ২০১৫ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এশিয়া এনার্জি কোম্পানির ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে জমা দেয়া ফুলবাড়ী খনির সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় আস্থা রাখতে না পেরে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরকে এ নিয়ে সমীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব দেয়। এশিয়া এনার্জি কোম্পানির মতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ফুলবাড়ী থেকে কয়লা উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশ অনেক ভাবেই লাভবান হবে। কোনো বিনিয়োগ ছাড়া অর্থাৎ শূন্য ঝুঁকিতে বাংলাদেশ এ প্রকল্পে থেকে লাভবান হবে। অথচ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ২০১৬, পৃ ১১০) বলে ভিন্ন কথা:

> *[খনি] এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর এবং ৩ বা ততোধিক ফসলের সমন্বয়ে গঠিত বিধায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখছে। টেকসই ভূমি সম্পদের ক্ষতি ও মানুষের পেশা হারানোর বিনিময়ে খনিজ সম্পদ আহরণ করা উক্ত এলাকা তথা জাতীয় পর্যায়ের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেখা দিতে পারে।*

জ্বালানি মন্ত্রণালয় নিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক কন্সালটেন্ট ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে দাখিল করা প্রতিবেদনে বলেছে যে, পরিবেশ, কৃষি, মানুষের জীবিকাসহ নানা কারণে বড়পুকুরিয়া এমনকি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খনি করা উচিত হবে না (ডেইলি সান, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের গবেষণা ও বড়পুকুরিয়া খনির জমি দেবে যাবার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে: বাংলাদেশের কয়লাখনিসমূহ থেকে (ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে) কয়লা তোলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত? দেখা গেছে, জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় 'খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষিজমি সংরক্ষণ' খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে আমলেই নেন না অনেক বিশেষজ্ঞ। কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, কৃষিনির্ভর মানুষের জীবিকা ও তাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি আমলে নিয়েই কয়লা উন্নয়নে মনোনিবেশ করা দরকার।

---

[২২] "উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পক্ষে মত দিয়েছে সরকারের অর্থনৈতিক থিংক ট্যাংক হিসাবে পরিচিত পরিকল্পনা কমিশন। সংস্থাটির মতে, দেশের প্রবৃদ্ধি চাইলে এবং লাভজনক হলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতেই যেতে হবে। ... প্রবৃদ্ধি চাইলে সৃষ্টিশীল ধ্বংস মেনে নিতেই হবে ... সম্প্রতি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের এক প্রতিবেদনে এসব বিষয় উল্লেখ করে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে" (দেখুন জনকণ্ঠ, ৪ ডিসেম্বর ২০১২)। অনেক চেষ্টা করেও এ প্রতিবেদন সংগ্রহ করা যায়নি। পরিকল্পনা কমিশনের এক কর্মকর্তা লেখককে ২০১৫ সালে জানান যে, এ ধরনের কোনো প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে কিনা তা তিনি সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানতে পারেননি।

বড়পুকুরিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের এসব বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারে না।[২৩] কোনো এলাকার জমি দেবে যাবার পর সরকার এডহক ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নেয়, যা কোনো টেকসই সমাধান নয়। এক সময়ের ধানি জমি এখন এক মিটার পানির নিচে। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এ অবহেলার মাধ্যমে সৃষ্ট খনি থেকে কয়লা উৎপাদনের মাশুল কে দিচ্ছে? একমাত্র জীবিকার উৎস ধানি জমি হারিয়ে ও ঘরবাড়ীর ফাটলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক মানুষ দিশেহারা।[২৪]

এ প্রেক্ষিতে 'খানা ভিত্তিক আয়-ব্যয়-দারিদ্র্য' বিষয়ক ২০১৬ সালের জাতীয় জরিপের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়। এ জরিপে দারিদ্র্য নিরসন নিয়ে যেমন আশাব্যঞ্জক তথ্য আছে, তেমনি কয়লা অঞ্চলের কথা বিবেচনা করলে হতাশাজনক তথ্যও আছে। বাংলাদেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমলেও কয়লাখনি অঞ্চলে এ সংখ্যা এখনও অনেক বেশি। ঐ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, দিনাজপুর জেলায় (যেখানে বেশিরভাগ কয়লাখনি অবস্থিত) দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বা তার বেশি। অথচ জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের শতকরা হার হলো যথাক্রমে ২৪.৩ ও ১২.৯। আসলে ২০১৬ সালের উক্ত জরিপ অনুযায়ী দিনাজপুর জেলায় দরিদ্র মানুষের হার ৬৪.৩ শতাংশ (BBS 2017:117)। সারা দেশে ২০০৬-২০১০ সময়কালে দারিদ্র্যের হার কমলেও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে (রংপুর-দিনাজপুর এলাকা) বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে কয়লাখনি উন্নয়ন ঐ অঞ্চলে দারিদ্র্যের প্রকোপ আরও বাড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে স্থানীয় কয়লা উন্নয়ন সম্পর্কে আরও সতর্কভাবে ভাবতে হবে। এমনকি 'উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি' ব্যবহার করার পূর্বে খনিতে বিনিয়োগ, উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ, কৃষি ভূমি, কৃষক-খেতমজুরের জীবন-জীবিকা, খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর এর প্রভাব এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। লাভ-ক্ষতির নিরিখেই কয়লা তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু স্থানীয় কয়লা উন্নয়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় কয়লা অঞ্চলের মানুষদের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে এসব বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করা হয় না। জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক জনপরিসরের আলোচনায় এটি একেবারেই অনুপস্থিত।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য, দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ও সমৃদ্ধ গ্রাম-বাংলা গড়তে কৃষির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে কৃষিই হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণের মূল অনুঘটক (World Bank ২০১৬)। গ্রামের মানুষের জীবিকার মূল হাতিয়ার কৃষি ভূমির ক্ষতি কোনো কিছু দিয়ে পোষানো যাবে না। ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় নগদ টাকা তাঁদের জন্য টেকসই কোনো সমাধান নয়। মাঠ গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকার রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবসায়ী সমাজের এলিটরা এ নিয়ে যা ভাবেন কয়লা অঞ্চলের মানুষের ভাবনা সে রকম নয়। সেজন্য যখনই ঢাকার এলিটগন ছুটে যান কয়লা উন্নয়নের জন্য ঐ অঞ্চলের মানুষদের জমি ছাড়া করতে, তখনই মানুষ প্রতিরোধের ডাক দেয়। কয়লা আবিষ্কার হলেই তা তুলতে হবে এটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ভাবনা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, কয়লা লবিস্ট, অর্থনীতিবিদ ও

[২৩] বড়পুকুরিয়া খনি কোম্পানির তথ্য থেকে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ব্যবহৃত ৩ বর্গ কিলোমিটার খনি এলাকার ১ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকার জমি ইতিমধ্যে দেবে গেছে; ভবিষ্যতে আরও ২ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা দেবে যাবে (Howladar 2016:382)।

[২৪] এক সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯১-১৯৯৫ সময়কালে এ খনির ডিজাইন ও চুক্তি চূড়ান্ত করার সময় ভূমি দেবে যাবার বিষয়টি আমলেই নেয়া হয়নি (ডেইলি স্টার, ১৮ জানুয়ারি, ২০০৯)। জমি ও ঘরবাড়ীর ক্ষতিপূরণ না পেয়ে স্থানীয় মানুষ এখনও আন্দোলন করছে (বাংলা ট্রিবিউন, ৬ ডিসেম্বর ২০১৭)।

ব্যবসায়ী সমাজের এলিটগণ কারিগরি দিক, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তথাকথিত 'সস্তা প্রাথমিক জ্বালানির' কথা বিবেচনা করে কয়লা তোলার স্বপক্ষে বলবেন। কিন্তু কয়লা অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কথা বিবেচনায় নিয়ে কয়লার ব্যবহার গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার।[২৫]

## ৬। বিশ্লেষণ: বিদেশী বিনিয়োগ, দুর্নীতি ও কয়লা উন্নয়ন

এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবিত ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্প প্রতিরোধের নিমিত্তে গড়ে উঠা গণআন্দোলন বাংলাদেশে এক দারুন নজির স্থাপন করেছে। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী শহরের নিমতলা মোড়ের কাছে ছোট যমুনা নদীর পাড়ে আন্দোলনকারীদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর আক্রমণে তিনজন নিহত হয়; আরও শতাধিক আহত হয়। এ হত্যাকাণ্ড খনিবিরোধী আন্দোলনকে নতুন মাত্রা এনে দেয়। স্থানীয় গণমানুষের জীবিকা, ভিটে-মাটি হারানোর উদ্বেগজনিত অতি আশংকার ফলে সৃষ্ট ব্যাপকমাত্রায় অংশগ্রহণের ফলে ঐ আন্দোলন কেন্দ্রের শক্তিশালী আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণের ক্ষমতাকে "আপ সাইড ডাউন" করতে সমর্থ হয়। ২৬ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ক্ষণিকের জন্য হলেও নড়ে যায়, এটি 'উপর' থেকে' নীচু' তলায় নেমে যায়। 'নীচু' তলার মানুষ এ সুযোগে কোনো ছাড় না দিয়ে আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণ থেকে পুরো পাওনা আদায় করে নেয়। এর সাক্ষী ৩০ আগস্টের আন্দোলনকারী ও সরকারের প্রতিনিধির মধ্যে স্বাক্ষরিত তাৎপর্যপূর্ণ সমঝোতা স্মারক, যা এর আগে বাংলাদেশে কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বাংলাদেশের আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণ এ সমঝোতা স্মারককে একটা 'ফরম্যাল চুক্তি'র মর্যাদা দিয়ে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে অনীহা প্রকাশ করায় ঐ আন্দোলন এখনো সক্রিয় আছে। কেন এ অবস্থা তৈরি হলো তার জবাব পাওয়া যাবে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনীতি ও সাধারণ অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি এই দুই বিষয়ের একাডেমিক গবেষণা থেকে (Ahmad 2001, Khan 2013, Khan *et al.* 2012, Mahmud *et al*. 2008, Murshid & Wiig 2001)। এই গবেষণাসমূহ থেকে কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত চিহ্নিত করা যায়: (১) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণ নিজেদের লাভের আশায় ব্যাপকভাবে নানাবিধ উপায়ে প্রভাব বিস্তার করেন, যা এ খাতে প্রকল্পের ঝুঁকি ও ব্যয় বাড়িয়ে তোলে; (২) রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যবসায়ী বিদেশী কোম্পানির স্থানীয় এজেন্টের ভূমিকা পালন করার নামে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিধি বহির্ভূত প্রভাব বিস্তার করেন; (৩) এতে আইন কানুনের তোয়াক্কা করা অনেক সময় বাধা হিসেবে কাজ করে; ফলে তা এড়িয়ে যাবার চাপ তৈরি হয় নীতিনির্ধারকদের উপর; (৪) এসব কিছুর নিট ফলাফল দাঁড়ায় এ খাতের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতির ছাপ। ফলে জনস্বার্থের বদলে আমলা, রাজনৈতিক এলিট ও কিছু স্থানীয় ও অস্থানীয় মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীর স্বার্থ বড় হয়ে উঠে। ফুলবাড়ী কয়লাখনি তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯৯৪ সালে বিএইচপির সাথে তখনকার প্রচলিত খনি বিধিমালার 'রয়্যালটি সংক্রান্ত' বিধি লংঘন করে দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লাখনি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ১৯৯৮ সালে এশিয়া এনার্জির কাছে ঐ চুক্তি হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিএইচপির বিশাল খনি কোম্পানি হিসেবে

[২৫] শ্রীলংকা যদি ২০৫০ সালের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ধাবিত হতে পারে (UNDP 2017), তাহলে বাংলাদেশকে কোন শক্তি আটকে রাখছে ব্যয়বহুল কয়লার মধ্যে? (দেখুন ফারুক ২০১৭) ।

কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ঐ সময় সরকার সময় নিয়ে (এমনকি জাতিসংঘের এক বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে) ১৯৯৪ সালে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অথচ ১৯৯৮ সালে সরকার কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি যে এশিয়া এনার্জি কি ধরনের কোম্পানি এবং বিএইচপি কি আইনসম্মতভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে? ২০০৬ সালের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, বিএইচপির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিদ্যমান খনি বিধিমালা অনুযায়ী তামাদি হয়ে যাওয়ায় এশিয়া এনার্জির কাছে সেটি হস্তান্তর করার কোনো প্রক্রিয়ার বিএইচপির ছিল না। অথচ এরূপ একটি কোম্পানির হাতেই সরকার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় খনির দায়িত্ব হস্তান্তর করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ফুলবাড়ী কয়লা খনির চুক্তি পাবার লক্ষেই বিএইচপি'র দুজন সিনিয়র ম্যানেজার অস্ট্রেলীয় একটি খনি বিষয়ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির উপর ভর করে এ কোম্পানি তৈরি করে এবং 'ম্যানেজম্যান্ট বাই-আউট' পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সরকারের অনুমোদনে বিএইচপি থেকে এ খনি সংক্রান্ত মালিকানা পেয়েছে।[২৬]

দুটো প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগে (১) কেন ১৯৯৪ সালে সরকার খনিবিধি মানেনি? (২) কেন ১৯৯৮ সালে সরকার তলিয়ে দেখেনি এশিয়া এনার্জি আদতে কোনো খনি কোম্পানি কিনা। পূর্বে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম থেকে চিহ্নিত অনুসিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, জনস্বার্থের বদলে আমলা, রাজনৈতিক এলিট এবং কিছু স্থানীয় ও অস্থানীয় মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীর স্বার্থ বড় হয়ে উঠায় এমনটি করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৬ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এশিয়া এনার্জির খনি উন্নয়ন প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে বলে যে, এটি আইনি, অর্থনৈতিক, কারিগরি ও পরিবেশগত দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য একটি প্রকল্প। ২০১২ সালে গঠিত আরেকটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও এতে ব্যাপক ত্রুটি চিহ্নিত করে। অথচ এ প্রকল্পের শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমলা, রাজনৈতিক এলিট, বিদেশী কূটনীতিক, ব্যবসায়ী ও খনি কোম্পানির নানা মাপের লবিস্টগণ ২০০৫-২০১৩ পর্যন্ত এর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছে।[২৭] এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য এর সাথে আরও তিনটি বিষয় যোগ করা দরকার ।

প্রথমত, সারা বিশ্বব্যাপী কয়লাখনি উন্নয়নে সরকারি/বেসরকারি কোম্পানির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার খনিজ সম্পদের উপর মালিকানা হেতু রয়্যালটি ধার্য করে।[২৮] এ রয়্যালটির হার ফিক্সড থাকে না; সময়ে সময়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে এটি হালনাগাদ করে; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি বাড়ানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। এশিয়া এনার্জির মতে খনির জীবনকালীন (৩৫ থেকে ৩৮ বছর বা তারও বেশি) সময়ে রয়্যালটির হার অপরিবর্তিত থাকবে সে নিশ্চয়তা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকগণ তাদের দিয়েছে (AEC, 2004c)। ২০০৬ সালের কয়লা নীতির এক খসড়া সংস্করণে রয়্যালটি'র হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় কাজে ব্যবহৃত কয়লা ও রপ্তানির জন্য নির্ধারিত কয়লার জন্য কয়লার মূল্যের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা রয়্যালটি নির্ধারণের জন্য একটা ফর্মুলা প্রস্তাব

---

[২৬] এ বিষয়ে দেখুন *The Financial Times*. (2004): "Asia Energy wins coal licence", 19 April, p.23।

[২৭] উল্লেখ করা দরকার, বাংলাদেশের সরকার এ নিয়ে অফিসিয়ালি কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি; এমনকি ফুলবাড়ী অঞ্চলে এ বিষয়ে সরকারের কোনো তৎপরতা সে সময় ছিল না; আজও নেই।

[২৮] যেমন ২০১২ সালে ভারত কয়লার রয়্যালটি বাড়িয়েছে, দেখুন *The Hindu* (2012): "Cabinet approves new royalty rates for coal, lignite", 12 April.

করায় খনি কোম্পানি আপত্তি জানায়।[২৯] খনি কোম্পানি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা তৎপরতার কারণে জাতীয় কয়লা নীতি ১৩ বছর (২০০৫-২০১৭) ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।[৩০] কেন এশিয়া এনার্জিকে এমন সুবিধা দেয়া হয়েছে যা এমনকি ভারতে দেয়া হয় না তার উত্তর নিহিত আছে উপরে উল্লেখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহে।

দ্বিতীয়ত, এশিয়া এনার্জি ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ফুলবাড়ীতে কয়লাখনি নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে খনি ইজারা পাবার জন্য আবেদন করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিএইচপি ফুলবাড়ীর কয়লার গভীরতা উন্মুক্ত খনি করার উপযোগী নয় বলে খনি উন্নয়নে আগ্রহী হয়নি। অথচ তৎকালীন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাথে সমঝোতার প্রেক্ষিতে (ডেইলি স্টার, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬, প্রথম পাতা) এশিয়া এনার্জি উন্মুক্ত খনি করার প্রস্তাব দিয়েছে। খনির ইজারা নেবার জন্য করা আবেদনে খনিবিধি মোতাবেক খনির প্রস্তাবিত মূল্যের শতকরা ৩ ভাগ অর্থ ব্যাংক গ্যারন্টি হিসেবে প্রদান করতে হবে। এ অর্থ সরকার খনিবিধি মোতাবেক রয়্যালটি, বাৎসরিক নানা ফি ও অন্যান্য বকেয়া নিশ্চিত করার জন্য নিয়ে থাকেন। এশিয়া এনার্জির মতে তারা খনি তৈরিতে প্রাথমিক পর্যায়ে আড়াই বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবেন। খনির জীবনকালীন আরও সাড়ে দশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। খনি থেকে বাংলাদেশের সরকারের প্রত্যক্ষ আয় হবে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। এসব অঙ্কের প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, এশিয়া এনার্জি খনির মোট মূল্য প্রাক্কলন করেছে। সে হিসাবে সরকারের কোষাগারে খনি উন্নয়নের অনুমতি লাভের আবেদনের সাথে শতকরা ৩ ভাগ হারে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়নি এশিয়া এনার্জি। বাংলাদেশের খনিবিধি অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া ঐ আবেদন অসম্পূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। ২০০৭ সালে সেনা নিয়ন্ত্রিত কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে কয়লানীতি তৈরির জন্য গঠিত পরামর্শক কমিটির সাথে মতবিনিময়কালে এশিয়া এনার্জির নির্বাহী কর্মকর্তাকে কমিটির এক সদস্য খনিবিধি মোতাবেক ব্যাংক গ্যারান্টি জমা না দেবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়টি তাঁরা নিষ্পত্তি করেছেন; তাই ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়া হয়নি।[৩১]

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের খনি-সম্পর্কিত আইন, বিশেষ করে খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২ (কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর ও ফুলবাড়ীতে ফিজিবিলিটি স্টাডির সময়ে খনি ও খনিজ বিধিমালা ১৯৬৮/২০০৪ সাল পর্যন্ত সংশোধনীসহ) অনুযায়ী খনি উন্নয়নের জন্য কোনো কোম্পানিকে প্রথমে বিধি মোতাবেক অনুসন্ধান লাইসেন্স দেয়া হয়; নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে কিছু শর্তের অধীনে অনুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স দেয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এ সময় কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আর্থিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও কারিগরি প্রতিবেদন তৈরি করে খনি উন্নয়নের জন্য একটা

---

[২৯] দেখুন *Daily Star* (2006): "Coal policy may get cabinet nod tomorrow: export to yield higher royalty", 9 July (প্রথম পাতা)।

[৩০] দেখুন 'বাংলাদেশ কয়লানীতি ২০১০ (প্রস্তাবিত খসড়া) এর উপর তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র মন্তব্য ও বক্তব্য' (২৪ নভেম্বর ২০১০ ঢাকার মুক্তি ভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত); ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (গ্যাস-তেল-কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিশন)এর উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য 'কয়লানীতি এবং তেল-গ্যাস অনুসন্ধান'।

[৩১] দেখুন New Age (২০০৭): "Phulbari contract covers mining lease, claims Asia Energy", 1 December.

পরিকল্পনাও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সরকারের কাছে জমা দেবে। এটি পর্যালোচনা করে সরকার সন্তুষ্ট হলে খনি উন্নয়নের জন্য কতগুলো শর্তের আওতায় 'মাইনিং লিজ' প্রদান করবে। অথচ ফুলবাড়ীর ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা হয়নি। এশিয়া এনার্জির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ সালেই তারা সরকারের কাছে মাইনিং লিজের জন্য আবেদন করে যা ২০০৪-এর এপ্রিল মাসে দেয়া হয়। এরই মধ্যে কোম্পানি লন্ডনের শেয়ারবাজারে নিবন্ধন করে শেয়ার ছেড়েছে, যাতে ফুলবাড়ী কয়লাখনিকে তাদের 'মূল সম্পদ' হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৩২] ২০০৪ সালে মাইনিং লিজ পাওয়াকে কোম্পানির 'বিশাল অর্জন' হিসেবে খনি বিনিয়োগ-সংক্রান্ত নানা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে (দ্য ফাইনান্সিয়াল টাইমস ও দ্যা গার্ডিয়ান) ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। ফলে শেয়ারের দামও বেড়েছে। এমনকি সরকারের কাছে জমা দেয়া খনি উন্নয়ন পরিকল্পনায় খনির মূল এলাকার (এরিয়া-বি,১৯২১ হেক্টর) জন্য মাইনিং লিজ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সত্য বিষয় হলো: ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল খনিজ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে জারি করা মাইনিং লিজ-সংক্রান্ত চিঠি বাতিল করে ১১ মার্চ ২০০৪-এ জারি করা চিঠি বহাল রাখা হয়। ১১ মার্চের চিঠিতে বলা হয়, এশিয়া এনার্জিকে এরিয়া-বি'র জন্য মাইনিং লিজ দেয়া হয়েছে শুধু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য।[৩৩] এখানে এটা চিহ্নিত করা খুব জরুরি যে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্সই মূল দলিল। আর খনি ও খনিজ বিধিমালা (২০১২) তে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য মাইনিং লিজ দেয়ার কোনো বিধান নেই। খনিজ উন্নয়ন ব্যুরো কোন বিবেচনায় ও কার স্বার্থে ২০০৪ সালের ১১ মার্চ 'মাইনিং লিজ' (তা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন) উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এশিয়া এনার্জি এ চিঠির ভিন্ন আইনি ব্যাখ্যা করেছে, যা বাংলাদেশের খনি বিধিসম্মত নয়। অন্যদিকে এশিয়া এনার্জি ২০০০ সালের নভেম্বরে কোন আইনি সূত্রে মাইনিং লিজের জন্য আবেদন করেছে তাও পরিষ্কার নয়। সে সময় এশিয়া এনার্জি সিদ্ধান্ত নেয় যে, মাইনিং লিজ দেয়া না হলে তারা ব্যয়বহুল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করবে না। অথচ বাংলাদেশের খনিবিধি এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে না।

উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয় থেকে বোঝা যায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে চাইলেই বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কানুনের প্রয়োগ উল্টিয়ে দেয়া যায়। এ বিষয়টিই ২০১৭ সালের বৈশ্বিক 'রিসোর্স গভর্নেন্স ইনডেক্স' প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে পারে না এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দারিদ্র্যের কারণে ফলে এঁরা নিজস্ব আইনকানুন (যদিও তা অপ্রতুল) নিজেরাই মেনে চলে না (NRGI 2017)। বিদ্যামান আইন উপেক্ষা করে খনিজসম্পদ উন্নয়নের এসব পদক্ষেপ শুধু কয়লা উত্তোলনের বিতর্কেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, ও প্রশাসন বিষয়ক একাডেমিক গবেষণায় দেখা যায় একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক/প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে বাধা হিসেবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থের জাল কেমন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোর

[৩২] ২০১২ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি একে বেআইনি বলে চিহ্নিত করে এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেন (ডেইলি সান, ২১ জানুয়ারি ২০১৩)।

[33] এই চিঠি দুটো পাওয়া যাবে AECB, (2006) এর পরিশিষ্টে। ১৩ মার্চের চিঠিতে উল্লেখ আছে "…in the interest of preparing feasibility report & submitting the report to the Government, the Government of the People's Republic of Bangladesh has granted mining lease for the applied area "B" (1921 hectares)…„

আলোকে করা সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে কায়েমি স্বার্থের এ জাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকেই কব্জা (state capture) করে ফেলেছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে (বারকাত ২০১৬)। একটা গণতান্ত্রিক সমাজ তৈরিতে বাধা হিসেবেই কাজ করে এরূপ বেআইনি ও দুর্নীতিগ্রস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি; শাসন ব্যবস্থার এরূপ গলদের জন্যই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণায় উল্লেখিত সামাজিক চুক্তির পূর্ণতা গত চার দশকেও ঘটেনি (Sobhan 2011)।

এশিয়া এনার্জির বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর পর আরেকটি রপ্তানি পণ্যের বিদেশী বাজার তৈরিই তাদের ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (AEC, ২০০৪প)। ঐ কোম্পানির শুভানুধ্যায়ী রাজনৈতিক নেতাগণ বিদ্যুৎ সংকট কাটানোর ক্ষেত্রে ফুলবাড়ী কয়লা খনির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে নানাকথা জনপরিসরে প্রচার করে খনির স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও[৩৪] খনি কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজ এবং লন্ডনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য তৈরি করা প্রতিবেদনে ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি ২০০৫ সালে কোম্পানির তৈরি করা ডকুমেন্টারিতেও ('ফুলবাড়ী- দ্য কোল ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ') এটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হাজির করা হয়েছে; কোম্পানি এ বিষয়ে কোনো রাখঢাক করেনি; কেননা এর ভিত্তিতেই তারা পুরো খনি প্রকল্প দাঁড় করিয়েছে। ফলে ২০০৬ সালের দিকে জাতীয় কয়লা নীতির এক খসড়া সংস্করণে যখন পুরো কয়লা রপ্তানির পরিবর্তে আংশিক রপ্তানি করার বিধান প্রস্তাব করা হয় এবং কয়লার রয়্যালটির হার (বিদ্যমান আইন অনুযায়ী) ফিক্সড না ধরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা কয়লার জন্য এক রকম হার ও বিদেশে রপ্তানি করা কয়লার জন্য আরেক রকম হার নিয়ে একটা ফর্মুলা প্রস্তাব করা হল তখন এশিয়া এনার্জি বেশ ক্ষুব্ধ হয়; এটাকে তারা বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে (ডেইলি স্টার, ৯ জুলাই ২০০৬) । রয়্যালটি হারের সাথে কোম্পানির লাভের অঙ্কের পরিমাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ২০০৪ সালে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে কোম্পানি বলেছে যে, খনির মেয়াদকালীন (৩৫-৩৮ বছর) কয়লার রয়্যালটি ফিক্সড থাকবে; কয়লা রপ্তানির জন্য কোনো কর দিতে হবে না এসব বাংলাদেশের সরকারের সাথে আলোচনায় সম্পাদিত বিনিয়োগ চুক্তিতে খনি কোম্পানি নিশ্চিত করে (AEC 2004)। ফলে কয়লা নীতির মাধ্যমে তা পাল্টে গেলে কোম্পানির লাভের অঙ্ক নিয়ে সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে যাবে। দেখা গেছে ২০০৫ থেকে ২০১৭ সময়কালে জাতীয় কয়লানীতি তৈরি হয়নি; সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও (২০১৬-২০২০) আগের মতো কয়লানীতি তৈরি সম্পর্কে কোনো সময়সীমা নির্দেশ করা নেই যেমনটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) ছিল।

এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত খনির প্রস্তাবে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকগণ যে খুব আকৃষ্ট হয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্মুক্ত খনির সমর্থনে জনমত তৈরির জন্য সুস্পষ্ট

[৩৪] উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বিবিসি বাংলা কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাদেশ সংলাপ' (দিনাজপুর, ৮ ডিসেম্বর ২০১২) এ ভূমি প্রতিমন্ত্রী ও খনি অঞ্চলের সংসদ সদস্য জানিয়েছেন যে ফুলবাড়ী কয়লাখনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদিত কয়লা দিয়েই ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ৫০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে (এ তথ্য এমনকি এশিয়া এনার্জির দলিলেও পাওয়া যায় না)। তিনি আরও বলেন, এ খনি করতে মাত্র ৫-৬ বর্গকিলোমিটার জায়গা লাগবে যদিও এশিয়া এনার্জির প্রতিবেদন অনুযায়ী ৭৮ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে মূল মাইনিং এলাকা আর এটা সহ পরোক্ষ মাইনিং এলাকা হচ্ছে সর্বমোট ৩১৪ বর্গ কিলোমিটার।

সরকারি দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে (Planning Commission 2011)। তার আগে ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটি উন্মুক্ত খনির পক্ষে জনমত তৈরির জন্য সরকারকে সুপারিশ করে (বিডি নিউজ ২৪, মে ১৭, ২০১১)। ২০১২-২০১৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় কয়লা অঞ্চলের মানুষদের উন্মুক্ত খনির লাভ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানোর এবং খনি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাঁদের অংশগ্রহনের বিষয় নিশ্চিত করণের কথা উল্লেখ করা হয় (বিডি নিউজ ২৪, জুন ৮, ২০১২)। ২০১১ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটি জার্মানির উন্মুক্ত কয়লাখনি সফর শেষে অতি তাড়াতাড়ি এশিয়া এনার্জিকে উন্মুক্ত খনি করার অনুমোদন দেবার জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। অবশ্য জার্মানি ও বাংলাদেশের কয়লা খনি তুলনীয় নয় মর্মে ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী, ২০১২ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং ২০১৫ সালে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজের শীর্ষ সংগঠন, এফবিসিসিআই এর সাথে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী বেশি পরিমাণ কয়লা আহরণের জন্য উন্মুক্ত খনির পক্ষে মত দেন (বিডি নিউজ২৪, ৬ মার্চ, ২০১৩)। উন্মুক্ত খনির সমর্থনে ব্যক্ত করা উপরোক্ত সব বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করে ২০১৫-২০১৬ সালে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, উত্তরাঞ্চলের কৃষিপ্রধান এলাকায় উন্মুক্ত কয়লাখনি অনেক ক্ষতি তৈরি করবে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিষয়েই ২০০৫ সালের শুরুতে খনিবিরোধী আন্দোলনকারীগণ প্রথম আলোকপাত করেন (জাতীয় কমিটি ২০০৫)।

বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চায়। সে লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সাল থেকে 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য নানা পরিকল্পনা শুরু করে (Planning Commission, ২০১২)। বাংলাদেশের উন্নয়নের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একটি হলো অবকাঠামোগত সমস্যা: উচ্চ হারের চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো এবং একাজে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা। গ্যাস সরবরাহের সংকট অনুমান করে ২০১০ সালে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ২০৩০ সাল নাগাদ ১৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্বালানি স্থানীয় কয়লা থেকে আসবে অনুমান করে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা তৈরি করে (MPEMR 2011)। জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্ভবত ভেবেছিল যে, ফুলবাড়ীতে শিগগিরই কয়লা উত্তোলন শুরু হবে আর বড়পুকুরিয়া থেকেও উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি করে কয়লার উৎপাদন বাড়ানো হবে। অথচ ২০০৫ সালের শুরু থেকে খনি অঞ্চলে উন্মুক্ত খনিবিরোধী আন্দোলন চলছে। চার বছরের মাথায় জ্বালানি মন্ত্রণালয় টের পেল ২০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনায় গলদ আছে। তাই তা বাতিল করে আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহার করে মহাপরিকল্পনা পুনরায় তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয় যা ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে চূড়ান্ত করার হয় (MPEMR 2016)। সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী খনির সপক্ষে যুক্তি দেয় যে, এ থেকে উৎপাদিত কয়লা দিয়ে চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত (GCM 2013, 2016, 2017)। এশিয়া এনার্জি ২০০০ সাল থেকেই বিদ্যুৎ সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ফুলবাড়ী খনির অবদানকে একীভূত করে দেনদরবার করে সফল হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি খাত-সংক্রান্ত একাধিক প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায় (Planning Commission 2011)। এশিয়া এনার্জির ২০১৫-২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আশাবাদী যে শিগগিরই

সরকার এ প্রকল্প অনুমোদন করবে। ২০১৬ সালের ঐ মহাপরিকল্পনায় আমদানি করা কয়লা দিয়ে বিশাল আকারের কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানোর সিদ্ধান্ত ছাড়াও স্থানীয় কয়লাখনি উন্নয়ন বিশেষ করে ফুলবাড়ী ও বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি করার সুপারিশ করা হয় (MPEMR 2016)। একই সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও স্থানীয় কয়লাখনি উন্নয়নের মাধ্যমে সস্তা বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে (Planning Commission 2015)। এশিয়া এনার্জি তাই শেয়ারহোল্ডারদের আশা জাগিয়ে রেখেছে যে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সরকার যেহেতু বদ্ধপরিকর, তাই ফুলবাড়ী খনি নিয়ে যে অচলাবস্থা আছে তা অচিরেই কেটে যাবে (GCM 2017)।

বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিতে ফুলবাড়ী খনি বিশাল অবদান রাখবে বলে এশিয়া এনার্জি ও সরকারের নীতিনির্ধারকরা যে বক্তব্য প্রচার করেছেন তা এশিয়া এনার্জি'র দলিলপত্র সমর্থন করে না। আর জ্বালানি মন্ত্রণালয় যেহেতু আলাদা করে এ খনি নিয়ে কোনো পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি তাই সরকারি অবস্থান ধোঁয়াশাই রয়ে গেল। এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত বিনিয়োগ চুক্তির 'অত্যন্ত উদার' শর্তের কারণে বাংলাদেশ এ থেকে খুব লাভবান হবে তা বলা যায় না। উল্লেখ্য যে, খনি কোম্পানি সমূহের সাথে গরিব দেশগুলোতে খনিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরিত বিনিয়োগ চুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব দেশের নিজস্ব আইনকানুন না মেনেই করা হয় এবং কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে দেশের আইন নয় বরং বিনিয়োগ চুক্তিই আমলে নিতে হয় (আফ্রিকার প্রেক্ষিতে এ নিয়ে বিশদ গবেষণার জন্য দেখুন Burgis 2015)।[৩৫] এশিয়া এনার্জির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি গোপন দলিল হওয়ার কারণে পাওয়া না গেলেও খনি কোম্পানির ২০০৪ সালের একটি প্রতিবেদনে চুক্তি-সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ফুলবাড়ী খনির কয়লা নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও এশিয়া এনার্জি অযথা একে 'উন্নয়ন' এবং 'বিদেশী বিনিয়োগের 'মাইলফলক' হিসেবে প্রচার করেছে। ঐ প্রতিবেদনে কোম্পানি বলেছে যে, তাদের প্রকল্পের প্রধান অবদান হবে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন রপ্তানি খাত তৈরি করা। অর্থাৎ কয়লা হবে বাংলাদেশের আরেকটি রপ্তানি পণ্য (AEC, ২০০৪)। কিন্তু কয়লা রপ্তানি থেকে কে লাভবান হবে? চুক্তি অনুযায়ী কয়লা রপ্তানির জন্য এশিয়া এনার্জি সরকারকে কোনো ট্যাক্স দেবে না (দেখুন রহমান, ২০১২)।

ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে জনপরিসরের আলোচনায় খনি কোম্পানি ও নীতিনির্ধারকদের তৈরি দাপুটে বয়ান হচ্ছে মানুষের জমি ও জীবিকার 'সাময়িক' ক্ষতি হলেও দেশের অর্থনীতিতে এ প্রকল্প ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিনিয়োগের বিশাল অবদান থাকবে। যেমন, প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের সংকট লাঘব হবে, বিদ্যুতের ঘাটতিজনিত কারণে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হবে না। এশিয়া এনার্জি'র সাথে 'রপ্তানি নির্ভর' বিনিয়োগ চুক্তি বহাল রেখে প্রাথমিক জ্বালানির সংকট মোকাবিলা করা যাবে বলে মনে হয় না; কোম্পানি চাইলে সব কয়লা রপ্তানি করতে পারবে (দেখুন রহমান ২০১২)।

[৩৫] বাংলাদেশেও এর নমুনা হিসাবে ১৯৯৭ সালে মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়; অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে অক্সিডেন্টালের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের কোনো বিধান পিএসসিতে ছিল না। ফলে বাংলাদেশের আইনে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান থাকলেও অক্সিডেন্টালের কাছ থেকে সরকার কোনো অর্থ আদায় করতে পারেনি; অক্সিডেন্টালও তার দায় স্বীকার করেনি।

বিদেশী বিনিয়োগ প্রশ্নে এশিয়া এনার্জি উল্লেখ করে থাকে কোম্পানির করপোরেট কর (৪৫ শতাংশ) থেকেও অনেক অর্থ আয় হবে (জিসিএম ২০১০)। কিন্তু বহুজাতিক করপোরেশন বিষয়ে যারা ওয়াকিবহাল তারা জানেন কী করে বহুজাতিক কোম্পানির চতুর হিসাব-নিকাশ তাদের লাভের অঙ্ককে এমনভাবে তৈরি করে যে 'হোস্ট কান্ট্রি' অনেক সময় লাভের ওপর অর্থবহ কোনো কর আদায় করতে পারে না। তাই করপোরেট কর থেকে বিশাল লাভের এ অনুমান খুবই সরলীকৃত (রহমান ২০১২)।

সাম্প্রতিক একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করলে এটি বুঝতে সুবিধা হবে । ২০১২ সালে যুক্তরাজ্য সরকার অবাক হয়ে দেখল যে গুগল, অ্যামাজন ও স্টারবাক্সের মতো জগদ্বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানি বেশ অল্প পরিমাণ করপোরেট কর দিয়েছে; কেননা কোম্পানিগুলোর হিসাব অনুযায়ী ওই দেশে ওই অর্থবছরে তাদের লাভের পরিমাণ অনেক কম ছিল। আসলে এসব কোম্পানি জটিল একাউন্টিং সিস্টেম ব্যবহার করে ঐ দেশে অর্জিত লাভের বড় একটা অংশ অন্য দেশে পাঠিয়ে দিয়ে করের পরিমাণ কমিয়ে ফেলেছে। সরকারি কর প্রশাসনের কিছুই করার নেই কেননা কোম্পানিগুলো কোনো অবৈধ কাজ করেনি।[৩৬] বাংলাদেশের কর প্রশাসন নিশ্চয়ই যুক্তরাজ্যের মতো শক্তিশালী নয় যে বহুজাতিক কোম্পানির এসব কারসাজি ধরতে পারবে। এজন্যই একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি জ্বালানি সম্পদ বিষয়ে চুক্তি করার আগে বিদেশী কোম্পানির চতুর আইনজীবী/অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে পাল্টা দেয়ার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে কিনা, তা বিবেচনা করতে পরামর্শ দিয়েছেন (রহমান, ২০০৮)। এখানে উল্লেখ্য যে, এশিয়া এনার্জির এক প্রতিবেদন মতে চুক্তি অনুযায়ী তারা 'অফশোর অ্যাকাউন্ট'-এর মাধ্যমে কয়লা বিক্রির লেনদেন করতে পারবেন (জিসিএম ২০১০)। সাম্প্রতিক সময়ে 'পানামা পেপারস' ও 'প্যারাডাইস পেপারস' কেলেঙ্কারি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো 'অফশোর অ্যাকাউন্ট' কেন ব্যবহার করে।

সম্প্রতি ফাঁস হওয়া গোপন নথিপত্র ঘেঁটে আফ্রিকা অঞ্চলের গণমাধ্যমে কর্মরত ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট-এর একদল বিশ্লেষক দেখিয়েছেন, আফ্রিকায় খনিজসম্পদ উত্তোলনে নিয়োজিত কোম্পানিগুলো কর ফাঁকি দেয়ার জন্য 'ট্যাক্স হেভেন' নামে পরিচিত দেশগুলোয় কয়েকশ অফশোর অ্যাকাউন্টধারী কোম্পানি তৈরি করেছে।[৩৭] উল্লেখ্য, অফশোর অ্যাকাউন্ট বিষয়ে বিএইচপি তৎকালীন সরকারের সঙ্গে বিশেষ দেনদরবার করেছিল (জিসিএম ২০১০)। তদুপরি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার কোম্পানিকে নয় বছরের জন্য কর অবকাশসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়েছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন-বিষয়ক সংস্থার এক প্রতিবেদনে খনি কোম্পানিকে দেয়া কর অবকাশ সুবিধার সমালোচনা করা হয়েছে (UNCTAD 2013:78-79)। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, এ ধরনের চুক্তি বহাল রেখে কয়লাখনির অনুমোদন দিয়ে বিদ্যুৎ সংকট লাঘব করে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে সফল হওয়া যাবে না। আর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এ ধরনের চুক্তিকেন্দ্রিক বিদেশী বিনিয়োগ কতটা অবদান রাখতে পারে? এ বিষয়ে একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ যথার্থভাবেই বলেছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদে বিদেশী বিনিয়োগের সুফল নির্ভর করে কী ধরনের বিনিয়োগ চুক্তি

---

[৩৬] দেখুন *The Guardian* (2012): "Amazon, Google and Starbucks accused of diverting UK profits," 12 November.

[৩৭] দেখুন*The Guardian* (2016): "Panama Papers reveal scale of offshore firms' African operations," 25 July.

হয়েছে তার ওপর। কারা চুক্তি করছে; কি শর্তে চুক্তি হচ্ছে; চুক্তি সম্পাদনে প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল কিনা- এসব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মত দেন। বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ে হৈচৈই তিনি আমলে না নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৮] তাঁর এ পর্যবেক্ষণ ফুলবাড়ী খনির চুক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য। খনিবিরোধী গণপ্রতিরোধ এ ক্ষেত্রে আসল কাজটিই করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। খনিজসম্পদ-বিষয়ক পাবলিক পলিসিতে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের চাপে অনেক সময় 'বৃহত্তর জনস্বার্থ' সংরক্ষিত হয় না। বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে শুরু করে এর বেশকিছু নজির আছে (দেখুন ইমাম ১৯৯০)। তবে ফুলবাড়ী কয়লাখনি এটি বোঝার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ।

## ৭। উপসংহার

বাংলাদেশে কৃষি জমি প্রতি বছরই কমছে। কৃষি জমি বিনাশ করে এবং পানি, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি করে উন্মুক্ত কয়লাখনি করার বিষয়ে কয়লা অঞ্চলের মানুষের ভাবনা বিচার করতে হবে। তাঁদের জীবন জীবিকা হারানোর উদ্বেগকে আমলে নিয়ে বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে। ২০০৫ সাল থেকে স্থানীয় মানুষ ও পরে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এতে যোগ দিয়ে তাঁদের দাবীগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছেন। বিপুল মানুষের জীবন-জীবিকা একটি বহুজাতিক কোম্পানির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে হুমকির মুখে পড়তে পারে না বলে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকগণ ১০ বছর পরে হলেও স্বীকার করেছেন। ২০১২ সালের শেষের দিকে জ্বালানি উপদেষ্টা মন্তব্য করেন যে, বহুজাতিক বা বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষা করবে না, তাই এ নিয়ে সরকার গভীরভাবে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি পর্যালোচনা করবে (দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ২৭ নভেম্বর ২০১২)। একই সাথে ভূগর্ভের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়েও জ্বালানি মন্ত্রণালয় অনেক সতর্ক হয়েছে; এ নিয়ে দুটো সমীক্ষা করেছে। জমি ও পানি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার এ দুই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নিয়ে সতর্কভাবে এগোতে হবে; দেরিতে হলেও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকগণ এটি স্বীকার করেছেন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন বজায় থাকায় তাঁরা চাপ বোধ করেছেন।

ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক শুধুমাত্র জমি,পানি ও পরিবেশ কেন্দ্রিক কোনো কারিগরি বিষয় নয়। এটি একই সাথে একটি রাজনৈতিক বিষয় এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই একটি রাজনৈতিক লড়াই। স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষের গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকারের সাথে এ লড়াই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একইভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় ক্ষমতা বলয়ের বাহিরে থাকা মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কিভাবে হবে তা নিয়েও এই বিতর্ক নানা ভাবনা হাজির করে। খনি প্রতিরোধের স্থানীয় আন্দোলনের ভাষা এসব বিষয়কে সামনে আনে যা এলিটকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনায় জায়গা পায় না। খনিজ সম্পদ উন্নয়নের নীতি ও নানা ভাবনা শুধু উপর থেকেই তৈরি হলে হবে না, সমাজের নীচের তলায় এ নিয়ে কি ভাবনা জাগে তাও আমলে নিতে হবে। জ্বালানি বিষয়ে বাংলাদেশের সরকার স্থানীয় মানুষের গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হবার কোনো সুযোগ আছে কিনা তা ভাবা দরকার।

---

[৩৮] মুশতাক খান (অর্থনীতির অধ্যাপক, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়), চ্যানেল আই টকশো (তৃতীয় মাত্রা, পর্ব-৪১৬৭), ২ জানুয়ারি ২০১৫।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, দেশের নানা আইনকানুনকে উপেক্ষা করে খনি উন্নয়নে অভিজ্ঞতাহীন কোনো একটা কোম্পনির সাথে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ চুক্তি করা হয়েছে। আশার কথা যে, খনিজসম্পদ নিয়ে এরূপ দুর্নীতির বিরদ্ধে খনি অঞ্চলের জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে ২০০৫ সালের শুরুতে যখন কয়লাখনি বিষয়ে বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকগণেরই কোনো ধারণা ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে এ প্রতিরোধ ধীরে ধীরে এতই তীব্র হয়ে উঠে যে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে সরকারের এক গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে জানিয়েছিল যে, স্থানীয় জনগণের মতামত আমলে না নিয়ে খনি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক হবে না (ডেইলি স্টার, ১৩ মার্চ ২০০৬, প্রথম পাতা)। ২৬ আগস্ট তীব্র গণঅসন্তোষের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। গত দশ বছরে এর কোনো পরিবর্তন যে হয়নি তা ২০১০ সালের অক্টোবরে, ২০১২ সালের নভেম্বরে এবং ২০১৪ সালের নভেম্বরে স্থানীয় মানুষ জানিয়ে দিয়েছে। এ সম্পর্কে ঢাকার নানা এলিট মহলের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। মাঠ গবেষণাকালীন সময়ে ফুলবাড়ীর নানা প্রান্তে এর প্রমাণ দেখা গেছে। লেখকের ধারণা নীতিপ্রণেতাগণ ধীরে ধীরে এটি বুঝতে পেরেছেন। ফলে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ সিদ্ধান্ত খনিবিরোধী আন্দোলনের ২০০৫ সালের শুরু থেকে উত্থাপিত দাবীসমূহকে সঠিক বলে মেনে নিচ্ছে। এতে অবশ্য স্বস্তি পাবার কোনো কারণ নেই। কেননা সরকারের নীতি বিষয়ক দুটি মূল দলিলে (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- ২০১৬-২০২০ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা ২০১৬) দেশীয় কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানির সংকট কাটানোর কথা বলা হয়েছে। ফলে সরকার এডহক ভিত্তিতে আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বললেও দীর্ঘমেয়াদি নীতি হিসেবে দেশীয় কয়লা উত্তোলনের উপরই ভরসা রাখছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণের 'রেন্ট সিকিং' চরিত্রের প্রেক্ষিতে খনিবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। জ্বালানি মন্ত্রণালয় এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়নি; এশিয়া এনার্জির অপেক্ষায় আছে। মাঠ গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সরকারের স্থানীয় কয়লা ব্যবহারের নীতি, তা যে যুক্তিতেই পরিবেশন করা হোক না কেন, কয়লা অঞ্চলের মানুষের ঐ নীতি প্রতিরোধের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে সফল হবে না।

ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে বিরোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাংলাদেশে জ্বালানি/খনিজ সম্পদ বিষয়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও বাজারের বাহিরে নাগরিক সমাজ থেকে প্রশ্ন তোলার উদ্যোগ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। স্থানীয় গণপ্রতিরোধের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে নানা সামাজিক আন্দোলন জ্বালানি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জনমত প্রভাবিত করার সক্ষমতা অর্জন করছে । ফলে এখাতে আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণকে নানা বিষয়ে এখন অনেক বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ২০১৪ পরবর্তী সময়কালে সরকারি নীতিতে বৃহত্তর জনস্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার কাজটি সম্ভব হয়েছে কয়লা অঞ্চলের জনগণ ও তাদের সহযোগী জাতীয় সংগঠন, কর্মী ও কিছু বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। এ থেকে জ্বালানি/খনিজ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় যদি প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত পরিবর্তনের সূচনা হয় তাহলে তা বাংলাদেশের জনগণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।

# গ্রন্থপঞ্জি


ইমাম, বদরুল (১৯৯০): *বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনা ও হরিপুর তেল বিতর্ক*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ইসলাম, মোহাম্মদ নুরুল (২০০১): *জ্বালানি সমস্যা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা: গণপ্রকাশনী।

কামাল, মেসবাহ, ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরীন (২০০৬): *নিজভূমে পরবাসী: উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (২০১৬): *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬*, ঢাকা: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

জাতীয় গণফ্রন্ট (২০০৫): ফুলবাড়ী কয়লাখনি: কার ক্ষতি, কার লাভ!, ফুলবাড়ী: জাতীয় গনফ্রন্ট।

জাতীয় কমিটি (২০১৩): "বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে সুন্দবনের কোনো বিকল্প নেই," ঢাকা: তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

_____ (২০০৬): "বাংলাদেশে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব ও দেশের স্বার্থ," ঢাকা: তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

_____ (২০০৫): "ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: কার লাভ কার ক্ষতি," ঢাকা: তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

জিসিএম (২০১০): "এশিয়া এনার্জি ও ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প " http://www.phulbaricoal.com/ (accessed 9 November 2010).

দাস, বিপ্লব (২০০৯): *ফুলবাড়ী কয়লাখনি ও বহুজাতিকের স্বপ্নভঙ্গ*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

ফারুক, ওমর (২০১৭): "জ্বালানি খাতের নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা," *বণিক বার্তা*, ২৪ জুলাই।

বাবলু, আমিনুল ইসলাম (২০০৫): "ফুলবাড়ী কয়লা সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসুন," *অনির্বাণ*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১, পৃ ৯-১১।

বারকাত, আবুল (২০১৬): *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা*, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

মুহাম্মদ, আনু (২০০৭): *ফুলবাড়ী, কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬*, ঢাকা: শ্রাবন প্রকাশনী।

_____ (২০০৬): *বাংলাদেশের তেল-গ্যাস: কার সম্পদ কার বিপদ*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

রহমান, মাহমুদুর (২০১২): *ফুলবাড়ীর রাজনীতি* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা: কাশবন প্রকাশন।

রহমান, হাবিবুর (২০০৮): *বাজার ও অদৃশ্য হস্ত*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।

সরেন, রবীন্দ্রনাথ, আহমেদ বোরহান ও মাহমুদুল সুমন (২০১৪): *জরীপ থেকে বয়ান: বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জাতিসত্তার মানুষের ভূমি সমস্যা কেন্দ্রিক সমীক্ষা ও বয়ান*, ঢাকা: সংবেদ।

AEC (2004a): *AIM Admission Document*, London: Asia Energy Plc (AEC).

____ (2004b): *Asia Energy Plc-Final Results (RNS Number 7840E)*, London: Asia Energy Plc (AEC).

____ (2004c): *The Phulbari Coal Project*, London: Asia Energy Plc (AEC).

____ (2004d): *Making Natural Resources Work for the People of Bangladesh*, London: Asia Energy Plc (AEC).

AECB (2006): *Phulbari Coal Project: Environmental and Social Impact Assessment*, Dhaka: Asia Energy Corporation (Bangladesh) Pty Ltd (AECB).

____ (2005): *Phulbari Coal Project: Public Consultation Disclosure Plan*, Dhaka: Asia Energy Corporation (Bangladesh) Pty Ltd (AECB).

Ahmad, Muzaffer (2001): *Governance, Structural Adjustment and the State of Corruption in Bangladesh* (Working Paper for SAPRI, Bangladesh), Dhaka: Center for Policy Dialogue.

BBS (2017): *Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 2016*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

____ (2014): *Population and Housing Census (Community Report: Dinajpur)*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Burgis, Tom (2015): *The Looting Machine*, London: William Collins.

Faruque, M. Omar (2017): "Neoliberal Resource Governance and Counterhegemonic Social Movement in Bangladesh," *Social Movement Studies*, 16(2): 254-259.

GCM (2017): *Annual Report*, London: GCM Resources Plc (GCM).

____ (2016): *Annual Report*, London: GCM Resources Plc (GCM).

____ (2013): *GCM Resources Plc and the Phulbari Coal Project*, http://www.gcmplc.com/ (accessed 20 June 2013).

Howladar, M. Farhad (2016): "Environmental Impacts of Subsidence around the Barapukuria Coal Mining Area in Bangladesh," *Energy, Ecology and Environment*, 1(6):370-385.

Imam, Badrul (2013): *Energy Resources of Bangladesh* (2nd edition), Dhaka: University Grants Commission.

Islam, Nazrul (2008): "Reflections on Phulbari Coal Project," *New Age*, 14 September.

Khan, Mushtaq H. (2013): "Bangladesh: Economic Growth in a Vulnerable LAO", *In* Douglass C. North, John J. Wallis, Steven B. Webb, Barry R. Weingast (edited) *In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development*, New York: Cambridge University Press, pp.24-69.

Khan, Mushtaq, Thyra Riley and Clay Wescott (2012): *Public-Private Partnerships in Bangladesh's Power Sector: Risks and Opportunities* (Report No. 86078), Washington, DC: The World Bank.

Mahmud, Wahiduddin, Sadiq Ahmed and Sandeep Mahajan (2008): *Economic Reforms, Growth, and Governance: The Political Economy Aspects of Bangladesh's Development Surprise* (Working Paper No. 22), Washington, DC: The World Bank.

Mahmud, Wahiduddin (2006): "Comments on Tata Investment Proposal," *The Daily Star*, March 22-24.

MLJPA (1980): *The Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980*, Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (MLJPA).

MPEMR (2016): *Power System Master Plan 2016*, Dhaka: Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR).

____ (2011): *Power System Master Plan 2010*, Dhaka: Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR).

Murshid, K. A. S. and Arne Wiig (2001): *A Review of Development Trends in the Energy Sector of Bangladesh* (Report No. R 2001:3), Bergen: Chr. Michelsen Institute.

NRGI (2017): *Resource Governance Index*, New York: Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Planning Commission (2015): *Seventh Five Year Plan: Accelerating Growth, Empowering Citizens*, Dhaka: Bangladesh Planning Commission.

____ (2012): *Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2121 A Reality*, Dhaka: Bangladesh Planning Commission.

____ (2011): *Sixth Five Year Plan: Accelerating Growth and Reducing Poverty*, Dhaka: Bangladesh Planning Commission.

Sobhan, Rehman (2011): "Bangladesh at 40: Looking Back and Moving Forward," Keynote speech delivered at a seminar on 40th Anniversary of Bangladesh's Independence, 30 December.

UNCTAD (2013): *Investment Policy Review: Bangladesh*, New York: United Nations.

UNDP (2017): *100% Electricity Generation through Renewable Energy by 2050: Assessment of Sri Lanka's Power Sector*, New York: UNDP.

World Bank (2016): *Dynamics of Rural Growth: Sustaining Poverty Reduction* (Report No. 103244-BD), Washington, D C: The World Bank.

____ (1992): *Bangladesh: Selected Issues in External Competitiveness and Economic Efficiency* (Report No. 10265-BD), Washington, DC: The World Bank.

____ (1991): *Bangladesh: Petroleum Exploration Promotion Project* (Report No. 10076), Washington, DC: The World Bank.

____ (1982): *Bangladesh: Issues and Options in the Energy Sector* (Report No. 3873-BD), Washington, DC: The World Bank.